ভারতের নারী পরিচয়

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত
অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়



এ, মুখার্জ্জী অ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

প্রকাশক
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
এ. মুখার্জ্জী অ্যাণ্ড কোং লিঃ
২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

দ্বিতীয় সংস্করণ, পৌষ, ১৩৬০

মূল্য দেড় টাকা মাত্র

মুদ্রাকর
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড
৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯

নিবেদন

ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভাণ্ডার হইতে বাছিয়া সাতজন ও পাঁচজন নারীর চরিত-কথা সংক্ষেপে বিবৃত করা হইল, যাঁহাদের কাহিনীর সহিত দেশের তরুণ মনের একটা ইতিহাস-সম্মত পরিচয় থাকা উচিত। ইঁহারা কেহই কল্পনা-রাজ্যের সৃষ্টি নহেন, সকলেই মানবী, এবং প্রত্যেকেই ইতিহাসের এক-একটা যুগকে এবং জীবনের কোনও না কোন ক্ষেত্রকে আলো করিয়া আছেন।

যে যে প্রাচীন গ্রন্থ ও আধুনিক রচনা হইতে এই গ্রন্থের উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে তাহার উল্লেখ এস্থলে অবান্তর।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
২৭শে মে, ১৯৫৩

বিনীত
গ্রন্থকার

কল্যাণীয়া শ্রীমতী উৎপলা ও জয়ন্তীর

করকমলে—

সূচীপত্র

প্রাচীন যুগ

মধ্যযুগ

প্রাচীন যুগ

ঘোষা

কবে, বিস্মৃত কোন্ অতীতে, ভারতীয় আর্য্যগণের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ রচিত হইয়াছিল, কেহ জানে না। খৃষ্টের দশ, বার কি পনের শতাব্দী অথবা তাহারও দীর্ঘকাল পূর্ব্বে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। তবে একথায় সংশয় নাই যে, নানা দেবতার উদ্দেশে বিভিন্ন ঋষি কর্ত্তৃক রচিত যে এক সহস্রেরও অধিক মন্ত্র, অর্থাৎ স্তব বা স্তুতি, ঋগ্বেদে আছে, সে সমুদয় একই সময়ের রচনা নয়, সেগুলি যুগ-পরম্পরা-বিস্তৃত এক সুদীর্ঘ কালে রচিত। যে যে ঋষি যখনই হোক্ যে যে মন্ত্র রচনা করিতেন, সেই সেই ঋষির বংশধরগণ সেগুলি পুরুষানুক্রমে নির্ভুলভাবে ও অতি পবিত্রজ্ঞানে মুখস্থ করিয়া রক্ষা করিতেন, পরে কোনও এক সময়ে এক বা একাধিক পুরুষ ধরিয়া কতিপয় আর্য্য ঐ বিক্ষিপ্ত মন্ত্রগুলিকে সংগৃহীত করেন, এবং তাঁহারাই আবার সেগুলিকে দশটি অসমান খণ্ডে বা মণ্ডলে সাজাইয়া গুছাইয়া একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থের রূপ দেন। আকারে মন্ত্রগুলি নিতান্ত ছোট নয়, প্রত্যেক মন্ত্রে কতগুলি স্তবক আছে, এই এক একটি স্তবকের নাম ঋক্। এই জন্যই দশটি মণ্ডলের ঋক্গুলির সংগ্রহকে বলা হয় ঋগ্বেদ-সংহিতা।

নানা দেবতাকে উদ্দেশ করিয়া রচিত প্রার্থনা হইলেও ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি সেকালের ভারতীয় আর্য্যদের সামাজিক জীবনের, আর্য্য পুরুষ ও নারীর জীবনযাত্রা-প্রণালীর উপর

প্রচুর আলোক-সম্পাত করে। সেই আলোকে দেখা যায়, গৃহে ও সমাজে নারী-জাতির মর্য্যাদা ছিল খুব উচ্চ। সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য কিংবা অবাধ স্বাধীনতা অবশ্য তাঁহাদের ছিল না। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগের ভারতীয় নারীর তুলনায় তাঁহারা অনেক বেশী স্বাধীনতা ভোগ করিতেন। বিবাহের পর নারী স্বামিগৃহে আসিয়া সেখানকার সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়া বসিতেন, এবং শ্বশুর, দেবর, অবিবাহিতা ননদ, দাসদাসী প্রভৃতির উপর আধিপত্য খাটাইতেন প্রভূত। শালীনতা রক্ষা করিয়া প্রয়োজনে তাঁহারা বাড়ীর বাহিরেও যাতায়াত করিতেন। এমন কি, কখনও কখনও তাঁহারা স্বামীর সহিত যুদ্ধযাত্রা করিয়া যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিতেন। একদা মুদ্গল-ঋষির বাড়ীতে কতগুলি দস্যু আসিয়া তাঁহার গরুগুলি চুরি করিয়া লইয়া গেলে, ঋষি ও তাঁহার পত্নী ইন্দ্রসেনা দুইজনে একত্রে দস্যুদের ধাওয়া করিয়া গরুগুলি উদ্ধার করিয়া আনেন। কখনও কখনও নারীগণ গ্রামের প্রকাশ্য মেলায় বা লোক-উৎসবে (সমন) কৌতুক দেখিবার জন্য ভীড় করিতেন। বিদথ নামে সম্ভবতঃ আর একটি অধিকতর ব্যাপক জন-সমিতি ছিল, সেখানেও গিয়া নারী-পুরুষ একত্রে গান গাহিতেন, খেলা করিতেন, প্রার্থনা করিতেন এবং পরামর্শও করিতেন। তখন মেয়েদের বিবাহ হইত বাল্যে নয়, যৌবনে। ঐ বয়সে তাঁহারা নিজেরাই নিজের নিজের বর নির্ব্বাচন করিয়া লইতেন, এবং পিতা বা পিতৃস্থানীয় অভিভাবক সম্মতি দিলেই বিবাহ সম্পন্ন হইত। কখনও কখনও মেয়েরা সমনে গিয়া নিজের নিজের বর অন্বেষণ করিতেন। অনেক সময়, কেহ কেহ

অধিক বয়স পর্য্যন্তও বর নির্ব্বাচনে সমর্থ না হইয়া পিতৃগৃহে বাস করিতেন, এইরূপ অধিক-বয়স্কা কুমারীকে বলা হইত—'অমাজুর'। মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধেও মাতাপিতা উদাসীন ছিলেন না, এবং অভিজাত ও আলোকপ্রাপ্ত পরিবারে ছেলেদের সহিত মেয়েদেরও শিক্ষার দুয়ার সমান খোলা থাকিত।

ইহার চেয়েও মূল্যবান কথা, ঋগ্বেদের যুগে নারীগণ স্বয়ং ঋত্বিক্ সাজিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিবার অধিকারিণী ছিলেন। অধিকন্তু, তাঁহারা মন্ত্রও রচনা করিতেন। ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি যে সবই পুরুষ-ঋষির রচিত তাহা নয়, অন্ততঃ আটজন নারী-ঋষির মন্ত্রও উহাতে স্থান পাইয়াছে। এই আট জনের নাম ঘোষা, বিশ্ববারা, অপালা, গোধা, অগস্ত্য-ভগিনী, লোপামুদ্রা, শশ্বতী ও রোমশা। ইহারা সকলেই সম্ভ্রান্ত ঋষিপরিবারের কন্যা ও বধূ। বিশ্ববারা ও অপালা অত্রি-ঋষির বংশীয়া, লোপামুদ্রা অগস্ত্য-ঋষির পত্নী, শশ্বতী অঙ্গিরস-ঋষির ও রোমশা বৃহস্পতির কন্যা। এই নারী-ঋষিদের রচিত মন্ত্রগুলি যে কবিত্বের বা ধর্ম্মের দিক দিয়া খুব উচ্চাঙ্গের, তাহা নয়। এগুলির মধ্যে শুধু তাঁহাদের ব্যক্তিগত নারী-জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সুখ-দুঃখের অনুভূতির কথাই রহিয়াছে। একে মন্ত্রগুলি নারীদের রচনা, তদুপরি মন্ত্রগুলির সাহিত্যিক ও ধর্ম্মগত মূল্যও বেশী নয়, তথাপি এই মন্ত্রগুলি বেদমন্ত্র বলিয়া সমাদৃতও হয়, সংগৃহীতও হয়। ঋগ্বেদের যুগে আর্য্য সমাজে নারীর সংস্থা ও মর্য্যাদা কত উন্নত ছিল ইহা হইতেই তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যায়।

এই আটজন মন্ত্র-রচয়িত্রীর মধ্যে ঘোষার রচিত ঋক্ই সংখ্যায় বেশী। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে (৩৯ ও ৪০ সূক্ত) ইহার মন্ত্রগুলি সন্নিবিষ্ট। ঘোষাও প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত ঋষিবংশের মেয়ে। ইহার পিতার নাম কক্ষীবৎ ও পিতামহের নাম দীর্ঘতমস্। এই দুইজন ঋষিরই অনেকগুলি মন্ত্র ঋগ্বেদে সংগৃহীত রহিয়াছে, এবং ইহারা দুইজনেই অশ্বী বা নাসত্য নামক দুই যমজ দেবতার উপাসক। এই অশ্বীদ্বয় যে কে ও কি তাহা বলা কঠিন, তবে তাঁহারা নাকি মানুষের বিপদে আপদে সর্ব্বদাই মুক্তহস্তে সাহায্য বিতরণ করিয়া থাকেন। দুর্গতদের সাহায্যের জন্য তাঁহারা দিনে ও রাত্রিতে তিনবার করিয়া স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। চ্যবন-ঋষি যখন বৃদ্ধ হইয়া আবার যুবক হইতে ইচ্ছুক হন, তখন অশ্বীদ্বয়ের আরাধনা করিয়াই পুনর্যৌবন লাভ করেন। ইহাদের অনুগ্রহে সমুদ্রে নিমজ্জমান ভুজ্যু এবং অগ্নিকুণ্ডে পতিত অত্রি নিস্তার লাভ করেন। খেল-রাজার রাণী বিশ্পলার, স্বামী-সহ যুদ্ধ করিতে গিয়া, একখানি পা কাটা গেলে তাঁহারাই তাঁহার শরীরে লোহার পা জুড়িয়া দেন। অশ্বীদ্বয় সম্বন্ধে সেদিনের লোকের এইরূপই ছিল বিশ্বাস।

ঘোষাও এই অশ্বীদ্বয়ের উপাসিকা। কথিত আছে, ঘোষার সর্ব্বশরীর শ্বেতকুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হওয়ায় অধিক বয়স পর্য্যন্ত তিনি অমাজুররূপে পিতৃগৃহে বাস করেন। তারপর এই অশ্বীদ্বয়ের আরাধনা করিয়া তিনি রোগমুক্ত হন, এবং তাঁহার যৌবনও নাকি ফিরিয়া আসে। তখন তাঁহার বিবাহও হয়, এবং কালক্রমে তিনি সন্তানের জননীও হন। কেহ কেহ মনে করেন, ঘোষার

এই স্বামীর নাম অর্জ্জুন, কিন্তু ইহা না-ও হইতে পারে। তাঁহার একটি রচনায় ঘোষা পিতৃগৃহে কুমারী-জীবন ও পরে সুখ-সৌভাগ্যলাভের উল্লেখ করিয়া অশ্বীদ্বয়ের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন, দেখা যায়। তাঁহার আর একটি রচনা পড়িয়া মনে হয় যেন ঘোষার স্বামী ছিলেন বিপত্নীক এবং ঘোষার সহিত তাঁহার বিবাহের সময় তিনি মৃতপত্নীর শোকে রোদন করিতেন; এই জন্যই এই মন্ত্রে ঘোষা স্বামীর সুখ ও স্বাস্থ্য ও নিজের জন্য স্বামীর ভালবাসা কামনা করিয়া অশ্বীদ্বয়ের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। ঘোষার পুত্রের নাম সুহস্ত্য, এবং কাহারও কাহারও অনুমানে, তাঁহারও রচিত একটি মন্ত্র ঋগ্বেদে আছে। কেহ কেহ বলেন, উহাও ঘোষারই, কেহ কেহ আবার বলেন, উহা এই দুইয়ের কাহারও নয়।

অত প্রাচীন কালেও ভারতের আর্য্য নারীগণ শিক্ষায় কত উন্নত ছিলেন, তাহা ঘোষা প্রভৃতি নারীর রচনা দ্বারা প্রমাণ হয়। নারীর এই জ্ঞানস্পৃহার চরম অভিব্যক্তি ঘটিয়াছিল সমগ্র বৈদিকযুগের শেষ প্রান্তে উপনিষদ রচনার যুগে। এই যুগের মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি বিদুষীর জীবনে প্রতিফলিত হইয়া রহিয়াছে সেই জ্ঞানলিপ্সার আত্যন্তিক পরিণতির কথা।

গান্ধারী

গান্ধারী মহাভারতকারের মানসী কন্যা নহেন, তিনি রক্ত-মাংসের মানবী। গান্ধারী-চরিতও কবিকল্পনার বিলাস নয়, তাহা খাঁটি বাস্তবের প্রকাশ। এই চরিত নিজের মহিমা ও ঐশ্বর্য্য ভারেই ঝলমল করিতেছে, ইহাতে কবির কল্পনার তুলিতে বেশী রং ফলাইবার স্থানও ছিল না, সুযোগও ছিল না।

গান্ধারীর চরিত্রে যে তিনটি গুণ দীপ্যমান, তাঁহার অপরাজেয় পতিপ্রাণতা, তাঁহার অপরিসীম ধৈর্য্য ও তাঁহার লোকোত্তর ধর্ম্মনিষ্ঠা, এই তিনের যে কোনও একটিই যে কোনও নারীর জীবন সার্থকতায় ভরিয়া তুলিতে পারে। ঐ তিনের সমবায়ে গান্ধারীচরিত্র এত গম্ভীর ও রহস্যঘন যে তাহার উপমা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না,—না কাব্যে, না ইতিহাসে। নারীর মধ্যে গান্ধারীর ও পুরুষের মধ্যে কর্ণের চরিত্র বাদ দিলে মহাভারতের কতখানি থাকে আর কতখানি যায়, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে সিন্ধু নদের এপার ও ওপার জুড়িয়া ছিল প্রাচীন গান্ধার দেশ। সে দেশের এক রাজা সুবল। সুবল রাজার কন্যার নাম গান্ধারী, গান্ধার দেশের মেয়ে বলিয়া,—যেরূপ কেকয় দেশের মেয়ে বলিয়া কৈকেয়ী, কোশল দেশের মেয়ে বলিয়া কৌশল্যা, মদ্র দেশের মেয়ে মাদ্রী, পাঞ্চাল দেশের মেয়ে পাঞ্চালী, ইত্যাদি। নিজের দেশের নামে নারীর

অভিহিতা হওয়ার এই রীতিটি এখনও রাজস্থান অঞ্চলে অনুসৃত।

এদিকে পুরাতন দিল্লীর নিকটে হস্তিনাপুরের কৌরববংশীয় রাজা বিচিত্রবীর্য্য অল্প বয়সে মারা যান যক্ষ্মারোগে। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হইয়াও ধৃতরাষ্ট্র সিংহাসনে বসিতে পারেন না, কারণ তিনি জন্মান্ধ। রাজা হন তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা পাণ্ডু। শোনা গেল, সুবল-রাজার দুহিতা গান্ধারী ভবানীপতির আরাধনা করিয়া বর লাভ করিয়াছেন, তিনি একশত পুত্রের জননী হইবেন। বিচিত্রবীর্য্যের বিমাতা-পুত্র ভীষ্ম তখন কৌরবগণের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ, তিনি ধৃতরাষ্ট্রের জন্য সেই কন্যার প্রার্থনায় গান্ধার-রাজের নিকট দূত প্রেরণ করেন। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ বলিয়া সুবল প্রথমটা ইতস্ততঃ করিতে থাকেন, অবশেষে ভাবী জামাতার কুল, শীল প্রভৃতির কথা প্রণিধান করিয়া বলেন, তথাস্তু। সে কথা শুনিয়াই, পাছে অন্ধ বলিয়া স্বামীর প্রতি মনে অশ্রদ্ধা বা তাচ্ছিল্যের রেখাপাত হয় সেই আশঙ্কায় গান্ধারী একখণ্ড বস্ত্র দ্বারা নিজের চোখ দুইটি সেই যে বাঁধেন, সে বাঁধন আর ইহজন্মে খোলেন নাই।

পতিগৃহে আসিয়া গান্ধারী গুণাভরণের ছটায় সকলের হৃদয় জয় করিয়া সকলকেই অতি আপনার করিয়া লন। তাঁহার গুণগৌরবে মহাভারতকার তাঁহার বিনম্রতা, শিষ্টতা, গুরু-শুশ্রূষা, প্রিয়ভাষণ প্রভৃতির কথাই বলিয়াছেন, অতিরঞ্জন কিছু করেন নাই। বলিয়াছেন, সেই অনিন্দিতার সুষম আচরণে সকলে মুখর তাঁহার প্রশংসায়। ক্রমে গান্ধারী দুর্য্যোধন, দুঃশাসন

প্রভৃতি বহু পুত্র, অত্যুক্তি করিয়া বলা হয় এক শত পুত্র, লাভ করেন, সেই সঙ্গে দুঃশলা নাম্নী একটি কন্যাও।

পাণ্ডুর মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন। শৌর্য্যে ও বহুতর গুণগ্রামে পাণ্ডবগণের দিনে দিনে যতই খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা বাড়িতে থাকে, ধৃতরাষ্ট্রের মনে ততই প্রবলতর অসূয়ার উদয় হইতে থাকে, আর রাজ্যলোলুপ দুর্য্যোধনও ততই তাঁহাদের শত্রুতা-সাধনের নব নব পন্থা উদ্ভাবন করিতে থাকেন। অর্দ্ধেক রাজ্য গ্রহণ করিয়া পাণ্ডবগণ হস্তিনাপুর ছাড়িয়া ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী স্থাপন করিয়া বাস করিতে লাগিলেও, সেই শত্রুতার অবসান হয় নাই। ইন্দ্রপ্রস্থে তাঁহাদের দ্রুত শ্রীবৃদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্কীর্ণ চিত্তকে আবার বিচলিত করিয়া তোলে কদর্য্য ঈর্ষ্যায়। ধৃতরাষ্ট্রের কূট আমন্ত্রণে সরল পাণ্ডবগণ হস্তিনাপুরে আসিলে দুর্য্যোধন মাতুল শকুনিকে দিয়া কপট পাশায় যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করিয়া তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব, এমন কি দ্রৌপদীকে পর্য্যন্ত জয় করিয়া লন, তখন অন্ধ ও পরিণতবয়স্ক ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার উচ্ছ্বসিত আনন্দের বেগ চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই। দুর্য্যোধন দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনয়ন করাইয়া তাঁহাকে অপমান ও লাঞ্ছনার চূড়ান্ত করিলেও কৌরবপক্ষের কেহ তাহার প্রতিবাদে একটি শব্দ করেন নাই, ধৃতরাষ্ট্র নিজেও না, তাঁহার ভয়ে আর কেহও না। তারপর যখন সভামধ্যে দ্রৌপদীকে সীমাহীন নির্লজ্জতায় বিবস্ত্রা করার চেষ্টা হইল, তখনও ধৃতরাষ্ট্র অবিচলিত মৌনতায় সম্মতিলক্ষণ প্রকাশ করিতে থাকেন। অতঃপর যাঁহার কাতর মিনতিতে ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে

তিরস্কার করেন এবং দ্রৌপদীকে বর দিতে চাহেন, যে বরে দ্রৌপদী পাশার পণ হইতে যুধিষ্ঠিরের মুক্তি চাহিয়া লন, তিনি গান্ধারী।

কিন্তু দুর্য্যোধনের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের তিরস্কার কতখানি মৌখিক ও কপট তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না, যখন তাঁহারই অনুমোদনে যুধিষ্ঠিরকে পাশার দানে দ্বিতীয় বার আহ্বানের বিষম পরিকল্পনা হয়। নিরপরাধ ও নিরীহ পাণ্ডুপুত্রদিগকে প্রবঞ্চনার বেড়াজালে জড়াইয়া তাঁহাদিগকে দীর্ঘ দিনের জন্য অজ্ঞাতবাসে পাঠাইবার ষড়যন্ত্রের কথা শুনিয়া গান্ধারীর অনিদ্র ধর্ম্মবুদ্ধি সহস্র ফণা তুলিয়া আস্ফালন করিতে করিতে তাঁহার অন্তরাত্মাকে দংশনে দংশনে রুধিরাক্ত করিয়া তোলে। তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া ছুটিয়া যান স্বামীর নিকটে, বলেন, মহারাজ, দুর্য্যোধন জন্মগ্রহণ করিলে মহামতি বিদুর বলিয়াছিলেন এই কুলপাংশুল শিশুকে অবিলম্বে সংহার কর, মঙ্গল হইবে। জাতমাত্র সে গর্দ্দভের ন্যায় চীৎকারও করিয়াছিল। আপনি বিদুরের কথা সেদিন উপেক্ষা না করিলে আজ এই কুলান্তক ফল উপস্থিত হইত না। দুর্য্যোধন আমাদের কুলের কলঙ্ক, আপনি উহার কথার কদাচ অনুমোদন করিবেন না, আমি বলিতেছি আপনি উহাকে পরিত্যাগ করুন।

সেই ধর্ম্মপ্রাণা, প্রখর বুদ্ধিমতীর কথায় ধৃতরাষ্ট্র সেদিন কর্ণপাতও করেন নাই। করিলে, হয়ত কুরুক্ষেত্রের সমরানল জ্বলিয়া উঠিত না, হয়ত ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত পুত্র অকালে প্রাণ হারাইত না, হয়ত ঘোর পাপিষ্ঠ বলিয়া দুর্য্যোধনকে ইতিহাসে এত কলঙ্কিত হইয়া থাকিতে হইত না, এবং হয়ত অন্ধ ও স্নেহান্ধ

বলিয়া ধৃতরাষ্ট্রের পূর্ব্বের অপরাধগুলি ইতিহাস অনেকখানি ক্ষমার চোখে দেখিত।

পাণ্ডবগণ তের বৎসর বনে বনে ফলমূল ভক্ষণ করিয়া অজ্ঞাতবাসের পর ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদের রাজ্যাংশ তাঁহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিতে বলায় দুর্য্যোধন বলেন, বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমিও দিব না। সুতরাং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠে। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ একদিন কুরুবৃদ্ধদের সমক্ষে দুর্য্যোধনকে পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি স্থাপনের হিত পরামর্শ দিয়া যুদ্ধ যাহাতে না বাধে তাহার শেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু মদমত্ত দুর্য্যোধন সকলের প্রতি অশিষ্টতা প্রদর্শন করিয়া রাগে গাত্রোত্থান করিয়া সেস্থান হইতে প্রস্থান করেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া বলেন, মহারাজ, এখনও পুত্রকে শাসন ও সংযত করুন, না পারেন ত উহার মন্ত্রিগণের সহিত উহাকে বিনষ্ট করুন, আপনার অপরাধে যেন সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস না হয়।

পুত্রের অশিষ্টাচরণে বিরক্ত ও শ্রীকৃষ্ণের সতর্কবাণীতে শঙ্কিত ধৃতরাষ্ট্র তখন গান্ধারীর শরণাপন্ন হইয়া বলেন, তোমার পুত্রকে সংযত কর, নতুবা সে রাজ্য ও জীবন দুই-ই হারাইবে। গান্ধারী সবার উপরে ধর্ম্মকেই সত্য বলিয়া জানেন, কাজেই সেদিন তিনি ধর্ম্ম হইতে বিচলিত স্বামীকেও ছাড়িয়া কথা বলেন নাই। তিনি বলিলেন, মহারাজ, দুর্য্যোধনের পাপপরায়ণতা কি আপনি আজ নূতন জানিলেন? আপনি নিজে কি তাহারই মত অনুসরণ করিয়া চলেন না? এখন সে কাম, ক্রোধ ও লোভের এতই বশ হইয়া পড়িয়াছে যে আজ বল প্রয়োগ করিয়াও তাহাকে

প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিবেন না। মূর্খ, কুসঙ্গী, দুরাত্মার হাতে রাজ্যভার সমর্পণ করিলে কি ফল হয়, আপনার কি তাহা জানা ছিল না? এখন সেই ফল আপনাকে ভোগ করিতেই হইবে। অনন্তর গান্ধারী দুর্য্যোধনকে ডাকাইয়া তাঁহাকে দৃপ্তকণ্ঠে স্মরণ করাইয়া দেন, রাজ্যের অর্দ্ধাংশই তাহার পক্ষে যথেষ্ট, পাণ্ডবদিগকে তাহাদের সমুচিত অংশ প্রদান করিয়া তাহাদের সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ না হইলে ধ্বংস অনিবার্য্য ও সন্নিকট। তারপর বলেন, তুমি ভাবিতেছ কুরুপিতামহ ভীষ্ম, অথবা দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতি বীরগণ তোমার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিবেন, কিন্তু জানিয়া রাখ তাহা কখনই হইবার নয়। কেননা, এই রাজ্যে তোমাদের ও পাণ্ডবদের সমান অধিকার, এবং এই সকল বীরগণের উভয় পক্ষের প্রতি সমান প্রীতি। কিন্তু পাণ্ডবগণ তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী ধর্ম্মশীল। যাঁহাদের ভরসায় তুমি যুদ্ধ চাহিতেছ তাঁহারা তোমার জন্য যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিতে পারিবেন, কিন্তু ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কখনই আঘাত করিতে পারিবেন না। অতএব মূঢ়তা ত্যাগ কর, লোভ ছাড়, অসহিষ্ণু হইয়া কৌরবগণকে কালগ্রাসে পাতিত করিও না, তোমার দোষে যেন সমস্ত দেশ ছারখার না হয়।

দুর্য্যোধন এই সকল নীতিকথা শুনিবার পাত্রই নন। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে দুর্য্যোধন প্রত্যহই সময়ে সময়ে জননীর নিকট গিয়া স্বপক্ষের জয় কামনা করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ করেন, কিন্তু প্রতিবারই গান্ধারী কেবলমাত্র এই কথাই বলেন, যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ, ধর্ম্ম যেখানে জয় সেখানে।

আঠার দিন পরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হয়। আঠার দিনে দুই পক্ষের আঠার অক্ষৌহিণী সৈন্যসামন্ত নিহত হয়। দুর্য্যোধন সহ ধৃতরাষ্ট্রের সকল পুত্রই ভীমের হাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। সমবেত যুযুৎসুগণের মধ্যে কেবল পাণ্ডব পক্ষে পঞ্চ পাণ্ডব, শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকি এই সাতজন, এবং কৌরব পক্ষে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা, দ্রোণের শ্যালক মহাবীর কৃপাচার্য্য ও ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা এই তিনজন মাত্র জীবিত থাকেন। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্ব্বুদ্ধি ও দুর্য্যোধনের পাপের ফল এইভাবে ফলে। ধৃতরাষ্ট্র পুত্রশোকে পাগলের মত হন। অন্যায় যুদ্ধে ভীম নাভির নীচে আঘাত করিয়া দুর্য্যোধনকে নিহত করিয়াছেন বলিয়া শঙ্কিত যুধিষ্ঠির ভাবেন, একথা শুনিবামাত্র গান্ধারী ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিবেন। অধর্ম্ম যুদ্ধে পুত্রকে মারিয়াছি শুনিলে নিশ্চয়ই তিনি আমাদের ভস্মসাৎ করিবেন। তপস্বিনী গান্ধারী ক্রুদ্ধা হইলে ত্রিলোক দগ্ধ করিতে পারেন। অতএব সবার আগে তাঁহার ক্রোধ শান্ত করা প্রয়োজন। ইহা ভাবিয়া যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে বলেন, তুমি ছাড়া আর কেহই তাঁহার সম্মুখে যাইতে সমর্থ হইবে না, তুমিই গিয়া গান্ধারীর ক্রোধ শান্ত কর। শ্রীকৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রের আবাসে গিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে যথাসম্ভব সান্ত্বনা দিয়া শোকবিহ্বলা গান্ধারীকে বলেন, দেবি, এ জগতে আপনার তুল্য নারী আর নাই। আপনার হিতবাক্য শুনিলে আজ আর এমন সর্ব্বনাশ ঘটিত না। আপনি না বার বার বলিয়াছিলেন যেখানে ধর্ম্ম সেখানেই জয়, আপনার কথাই ত ফলিয়াছে, সুতরাং আপনি শোক ত্যাগ করুন, ক্রোধের বশে পাণ্ডবগণের বিনাশ কামনা

করিবেন না। গান্ধারী বলেন, কেশব। তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সত্য। দারুণ শোকে আমার মন বিচলিত হইয়াছিল, তোমার কথায় আমি শান্ত হইলাম। গান্ধারী আর বেশী কিছু বলিতে পারেন না, অঙ্গবস্ত্রে মুখ ঢাকিয়া অশ্রুমোচন করিতে থাকেন। এইভাবে সেই ধৈর্য্যের প্রতিমা সেদিন ক্ষমা করেন তাঁহার পুত্রহন্তাগণকে।

কিন্তু শোকের ধর্ম্মই এই যে উহা নিরবধি সমভাবে থাকে না, ইন্ধন পাইলেই উহা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতে চায়। পুত্র, পৌত্র ও পিতৃগণের প্রেতকার্য্য সম্পাদনের জন্য গান্ধারী ও অন্যান্য পুরনারী সহ ধৃতরাষ্ট্র হস্তিনা হইতে সমরাঙ্গনে যাত্রা করিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে যুধিষ্ঠির সেই অভিমুখে রওনা হন, সঙ্গে যান চারি ভ্রাতা, শ্রীকৃষ্ণ ও দ্রৌপদী। কিছুদূরে গিয়া দেখেন শোকভারে অবনত, বৃদ্ধ, ধৃতরাষ্ট্র মহিলাগণ-পরিবৃত হইয়া ধীরে ধীরে চলিতেছেন জাহ্নবীর তীরের দিকে। যুধিষ্ঠির অগ্রসর হইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম করেন। ধৃতরাষ্ট্রের সর্ব্বাপেক্ষা রাগ ভীমের উপর। সেদিন সেই রাগে তিনি সেখানে লৌহভীম চূর্ণ করিয়া জীবনের বেলাশেষে আরও খানিকটা অপযশের ভাগী হন। তারপর তাঁহারা যান গান্ধারীর নিকট। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আর শত্রু নাই, ইহা ভাবিয়া ভাবিয়া গান্ধারীর সারা মনে এমনই আগুনের শিখা ছড়াইয়া যায় যে, যুধিষ্ঠিরকে শাপ দিব বলিয়া ইচ্ছা করেন। ইতিমধ্যে ব্যাসদেব সহসা সেখানে আসিয়া গান্ধারীকে শান্ত করিবার জন্য, শ্রীকৃষ্ণের মতই, বলেন, মা, তুমি আগাগোড়াই ধর্ম্মের জয়

চাহিয়াছ, তোমার কথা ত মিথ্যা হইতে পারে না, ধর্ম্মেরই জয় হইয়াছে। তবে কেন ধর্ম্মরাজকে আজ শাপ দিতে চাও? আগে তোমার কত না ক্ষমাগুণ ছিল, আজ তাহা গেল কোথায়? গান্ধারী উত্তর দেন, পাণ্ডবদের প্রতি আমার কোনই ঈর্ষ্যা নাই। উহারা বিনষ্ট হয় ইহাও আমি চাই না। আমি জানি দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি প্রভৃতির অপরাধেই কুরুকুল ধ্বংস হইয়াছে, পাণ্ডবদের কিছুমাত্র অপরাধ নাই। কৌরবগণ দর্প করিয়া সংগ্রামে নিহত হইয়াছে, সেজন্য আমি কিছুমাত্র আক্ষেপ করি না। কিন্তু ভীম কেন দুর্য্যোধনের নাভির অধোদেশে গদাঘাত করিল, উহার সেই অধর্ম্মই আমার রাগের আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে।

গান্ধারীর কথায় ভীম ভয়ে ভয়ে তাঁহার নিকট আসিয়া নিজের অপরাধ সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়া অনুনয় করিয়া বলিতে থাকেন, মা, আমি আত্মরক্ষার জন্য ভয়ে যে কাজ করিয়া ফেলিয়াছি, ধর্ম্মই হোক্, আর অধর্ম্মই হোক্, আপনি তাহা ক্ষমা করুন। ধর্ম্মযুদ্ধে তাহাকে সংহার করা অসাধ্যপ্রায় ছিল, কিন্তু সে প্রতিনিয়ত আমাদের সঙ্গে শঠতাচরণ করিয়াছে এবং তাহাকে বিনাশ করিতে না পারিলে রাজ্যলাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই, এই জন্যই আমি অধর্ম্মের পথ অবলম্বন করিয়াছিলাম। গান্ধারী বলেন, এই কারণে দুর্য্যোধনকে অধর্ম্ম অনুসারে নিহত করিয়া প্রশংসার কাজ কর নাই। নকুলের অশ্ব বিনষ্ট করিয়াছিল বলিয়া দুঃশাসনের রক্ত তুমি পান করিয়াছিলে, সে কাজও সাধুজনের নয়, অনার্য্যের। কিন্তু, ভীম, আমাদের এতগুলি

পুত্রের মধ্যে যে তোমাদের অল্প অপরাধ করিয়াছিল এমন একটিকেও কি অবশিষ্ট রাখিতে পারিতে না? সেই পুত্রই এখন এই দুই অন্ধের যষ্টির মত হইত। এই বলিয়া গান্ধারী সক্রোধে প্রশ্ন করেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এখন কোথায়? যুধিষ্ঠির কাঁপিতে কাঁপিতে গান্ধারীর সম্মুখে আসিয়া করজোড়ে বলেন, দেবি, আমি আপনার পুত্রহন্তা, আপনাদের রাজ্যনাশের একমাত্র হেতু, আপনি আমাকে অভিশাপ দিন, এই রাজ্য, এই জীবন, এই ধনে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই আমার। বলিয়া যুধিষ্ঠির অবনত হইয়া গান্ধারীর চরণে নিপতিত হইবার উপক্রম করেন। গান্ধারী তাঁহার কথার কোনও উত্তর না দিয়া শুধু দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া নেত্রবন্ধনীর নীচে দিয়া যুধিষ্ঠিরের পায়ের আঙ্গুলের অগ্রভাগ দর্শন করেন, দৃষ্টিপাত-মাত্র যুধিষ্ঠিরের নখ বিকৃত হইয়া যায়, যুধিষ্ঠির কুনখী হন। এই দেখিয়াই চোখের পলকে মহাবীর অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের আড়ালে চলিয়া যান, আর নকুল-সহদেব বিবর্ণমুখে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে থাকেন। তখন গান্ধারী ক্রোধ সম্বরণ করিয়া জননীর ন্যায় তাঁহাদের সান্ত্বনা দেন।

ইহার পর ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও অন্যান্য কৌরবমহিলা, পাণ্ডবগণ, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি সংগ্রামভূমিতে গমন করেন। সেখানে শুধু রহিয়াছে, কোথাও স্তূপের আকারে, কোথাও বিচ্ছিন্নভাবে, অসংখ্য নর, হস্তী ও অশ্বের স্ফীত ও গলিত শবদেহ, শুধু মথিত প্রাণীর মেদ, মজ্জা, অস্থি, রক্ত আর কেশ, শুধু ভাঙ্গা রথ, ভাঙ্গা ধনুক, ভাঙ্গা খড়্গ ও গদা, শুধু ছিন্ন হার, ছিন্ন অঙ্গদ, ছিন্ন কুণ্ডল,

ছিন্ন বর্ম্ম, আর শৃগাল, কুকুর ও কাক-শকুনির উন্মত্ত তাণ্ডব। তারপর খুঁজিতে খুঁজিতে ভগ্নোরু দুর্য্যোধনের মৃতদেহ দেখিয়া গান্ধারী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন। সংজ্ঞা লাভ করিয়া রণশয্যায় শয়ান রক্তাক্ত-কলেবর কুরুরাজকে আলিঙ্গন করিয়া তিনি, হা পুত্র! হায়রে আমার পুত্র! বলিয়া মর্ম্মভেদী বিলাপ করিতে থাকেন। তাঁহার চোখের জলে দুর্য্যোধনের বিশাল বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে থাকে। দুর্য্যোধনের জন্য তাঁহার বুকে যে এতখানি ব্যথা জমা ছিল ইহা বোধ হয় তিনিও আগে জানিতেন না। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া ভূতলশায়ী বহু বীরের মৃতদেহ দেখিতে দেখিতে বহুক্ষণ খেদোক্তি করিয়া ধৈর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি গান্ধারী ক্ষণিকের জন্য হতজ্ঞান হন। কেন জানি তাঁহার মনে হয় শ্রীকৃষ্ণই এই ভীষণ লোকক্ষয়ের নিদান, তিনি ইচ্ছা করিয়াই কৌরবগণের বিনাশে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। তখন ক্রোধভরে তিনি বাসুদেবকে অভিসম্পাত করেন, আমি পতিশুশ্রূষার দ্বারা এতকাল যা কিছু তপ সঞ্চয় করিয়াছি, সেই তপের প্রভাবে তোমাকে অভিশাপ দিতেছি যে, তুমি যেমন কৌরব ও পাণ্ডবদের জ্ঞাতি-বিনাশে উপেক্ষা দেখাইয়াছ, তেমনি তোমার নিজের জ্ঞাতিবর্গ তোমার দ্বারাই বিনষ্ট হইবে।

শত্রুসমুদয় নিহত হওয়ার পরে পাণ্ডবগণ রাজ্যলাভ করিয়া ছত্রিশ বৎসর তাহা উপভোগ করেন। তাহার মধ্যে পনের বৎসর ধৃতরাষ্ট্রের মতানুসারে তাঁহাদের রাজ্য প্রতিপালিত হয়। ঐ সময় পাণ্ডবগণ সর্ব্বদা ধৃতরাষ্ট্রের উপাসনা ও চরণ-বন্দনা করিতেন। কুন্তী সতত গুরুপত্নীর ন্যায় গান্ধারীর সেবা করিতেন।

যুধিষ্ঠির প্রত্যহ মূল্যবান শয্যা, পরিধেয়, আভরণ ও রাজোচিত বিবিধ ভোজ্যসামগ্রী ধৃতরাষ্ট্রকে পাঠাইয়া দিতেন, কিন্তু পরে জানা গেল ধৃতরাষ্ট্র অথবা গান্ধারী এ সকল কিছু স্পর্শও করিতেন না, তাঁহারা কোনও দিন দিবার চতুর্থ ভাগে, কোনও দিন বা অষ্টম ভাগে, ক্ষুধা নিবারণের জন্য যৎকিঞ্চিৎ আহার করিতেন এবং প্রতিদিন ভূতলে কুশ বিছাইয়া শয়ন করিতেন।

পনের বৎসর পর একদা ভীমসেন এক অনর্থ ঘটাইয়া বসেন, সকলের সম্মুখে এবং ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকেও শুনাইয়া শুনাইয়া সক্রোধে কহেন, এই বাহু দিয়াই আমি ধৃতরাষ্ট্রের তনয়দিগকে যমালয়ে পাঠাইয়াছি। ভীমের এই পুরুষবাক্যে, সমস্ত কার্য্যই কালের প্রভাবে হইয়া থাকে বিবেচনা করিয়া বুদ্ধিমতী গান্ধারী কিছুমাত্র দুঃখিত হন না, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র আর সংসারে থাকিতে চাহেন না, বনে গিয়া বায়ুভক্ষণ দ্বারা তপশ্চর্য্যা করিতে সঙ্কল্প করেন। কুন্তী ও সঞ্জয়ও অরণ্যাশ্রমে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর অনুগামী হন। এক কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় কুন্তী ও গান্ধারী আপনাদের স্কন্ধদেশে বল্কলাজিন-পরিহিত ধৃতরাষ্ট্রের হাত দুইখানি স্থাপন করিয়া হস্তিনা ত্যাগ করিয়া যান। প্রথমতঃ তাঁহারা কিছুদিন গঙ্গার তীরে বাস করেন, সেখান হইতে কুরুক্ষেত্রে গমন করেন। সেই স্থানে গান্ধারী ও কুন্তীও বল্কলাজিন ধারণ করিয়া ইন্দ্রিয়-সংযমে ঘোরতর তপস্যা করিতে থাকেন, এবং তপশ্চরণে প্রবৃত্ত ধৃতরাষ্ট্র ক্রমশঃ ক্রমশঃ অস্থি-চর্ম্মসার হন। দুই বৎসর পরে কুরুক্ষেত্র হইতে তাঁহারা সকলে যান গঙ্গাদ্বারে, সেই পুণ্যতীর্থেও তাঁহারা ছয় মাস কঠোর

তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। গান্ধারী কেবলমাত্র জল পান করিয়া, আর কুন্তী এক মাসের পর একদিন মাত্র ভোজন করিয়া কাল কাটাইতে থাকেন। ছয় মাস পরে তাঁহারা আবার কুরুক্ষেত্রের পুরাতন কাননে ফিরিয়া আসেন। অনন্তর একদিন ধৃতরাষ্ট্র গঙ্গা-সলিলে অবগাহন করিয়া স্বীয় আশ্রমে আসিতেছেন, অকস্মাৎ প্রচণ্ড বায়ুতে ভীষণ দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়া সমুদয় বন দগ্ধ করিতে থাকে। অগ্নির সেই তীব্র দহনে যাবতীয় পশুপক্ষী পুড়িয়া মরিতে থাকে। ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তী তিনজনেই অনাহারে এত ক্ষীণ হইয়াছিলেন যে, পলাইয়া সেই ভীষণ বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিবেন, সে সাধ্য তাঁহাদের ছিল না। সঞ্জয় বাঁচিয়া যান, আর তিনজন বসিয়া বসিয়া ইন্দ্রিয়রোধ করিয়া দাবদাহে ভস্মীভূত হন।

যশোধরা

বৈদিক ও মহাভারতীয় যুগের পর ভারতবর্ষে যে যুগ আপন বৈশিষ্ট্যে ও মহিমায় ভাস্বর হইয়া উঠে, ইতিহাসে তাহার নাম বুদ্ধের যুগ।

কথিত আছে, যে বৈশাখী পূর্ণিমায় কপিলবাস্তু হইতে তাঁহার পিত্রালয় দেবদহে যাইবার পথে লুম্বিনী নামে উদ্যানে মায়াদেবী গৌতম-সিদ্ধার্থকে প্রসব করেন, সেইদিনই পৃথিবীর নানাস্থানে আরও সাতটি প্রাণীর আবির্ভাব হয়, তাহার মধ্যে একজন মানবী। এই নারীর পাণ্ডিত্যে, বীরত্বে অথবা ত্যাগে নিজস্ব বিশেষ কোন পরিচয় নাই, কোন কীর্ত্তিসম্ভারও তিনি অনাগত কালের জন্য পশ্চাতে রাখিয়া যান নাই। কিন্তু তাঁহার বিশ্ব-নন্দিত স্বামীর পরিচয়ে নারী-সমাজে তিনি সমধিক গৌরবিণী। এ জগতে কোন্ নারী তাঁহার চেয়ে উন্নত মস্তকে বলিতে পারেন, তাহার স্বামী শত রাজচক্রবর্ত্তী অপেক্ষা অধিক বরেণ্য?

ইনিই শাক্যসিংহ গৌতমের পরিণীতা, রাহুল-জননী। বৌদ্ধদের প্রাচীন সাহিত্যে ইহার নামটি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সেখানে তাঁহার উল্লেখই খুব কম, দুই-এক স্থানে যাহা আছে তাহাও রাহুল-মাতা বলিয়াই। কিন্তু পরবর্ত্তী সাহিত্যে তাঁহার নামের অভাব নাই, কোথাও যশোধরা, কোথাও গোপা, কোথাও বা ভদ্রকাঞ্চনা, বিম্বা, বিম্বাসুন্দরী অথবা সুভদ্রকা।

তবে অধিকতর স্থলেই নামটি যশোধরা। তিব্বতীয় এক ঐতিহ্যে যশোধরার এক সপত্নীর নাম গোপা।

যশোধরার পিতার নামও অনিশ্চয়ের গর্ভে। কোনও কোনও গ্রন্থে তাঁহার নাম দণ্ডপাণি, কোথাও কোথাও তিনি দণ্ডপাণির ভ্রাতা সুপ্রবুদ্ধ। কিন্তু দণ্ডপাণিই হোন্ বা সুপ্রবুদ্ধই হোন্, বৌদ্ধ কিম্বদন্তী অনুসারে ইঁহারা মায়ার সহোদর, অর্থাৎ গৌতমের মাতুল। অপর এক বিবরণে আবার যশোধরার মাতা অমৃতা গৌতমের পিসিমা। তাহা হইলে, বিবাহের পূর্ব্বে যশোধরা ছিলেন গৌতমের হয় মামাতো, না হয় পিসতুত ভগিনী। ইহা বিচিত্র কিছু নয়, কারণ প্রাচীন ভারতে যদু, শাক্য প্রভৃতি জাতির মধ্যে, এবং পরে দাক্ষিণাত্যে অন্ধ্রের ইক্ষ্বাকু ও মহারাষ্ট্রের রাষ্ট্রকূট বংশে মামাতো-পিসতুত ভাই-ভগিনীর এরূপ বিবাহ না হইত তাহা নয়। কিন্তু যে জনশ্রুতি বলিতে চায় গৌতম ও যশোধরা একই দিনে জন্মিয়াছিলেন, যশোধরা ছিলেন স্বামীর সমবয়স্কা, তাহা সত্য কিনা স্থির করা কঠিন।

গৌতমের বিবাহ হয় তাঁহার ষোলবৎসর বয়সে। তাঁহার পিতা শাক্য-নায়ক শুদ্ধোদন, কথায় বলে রাজা শুদ্ধোদন, গৌতমের শিক্ষা সমাপনান্তে পুত্রের বিবাহ দিতে অভিলাষী হন। অনেক দেখা-শুনা ও বিচার-বিবেচনার পর তিনি দণ্ডপাণি অথবা সুপ্রবুদ্ধের দুহিতাকে ভাবী পুত্রবধূ মনোনীত করেন। প্রতিমার মত ঢলঢল রূপ, মরালীর মত তনুখানি হাঁটিয়া যায়, ভ্রূ-লতার তলে লাবণ্যের দুইটি খনি, ঠোঁটের প্রান্তে অমিয় ক্ষরিয়া পড়ে,

এ মেয়ের তুলনা কই ? কিন্তু তাঁহার মনন সিদ্ধার্থেরও মনঃপূত হয় কিনা তাহা জানিবার অভিপ্রায়ে তিনি একটি অভ্যর্থনা-সভার আয়োজন করেন। এই সভায় গৌতম অশোক-ভাণ্ড বিতরণ করিবেন। অভিজাতকুলের অন্যান্য মেয়েদের ন্যায় যশোধরাও অশোক-ভাণ্ডের প্রার্থিনী হইয়া সেই সভায় আগমন করেন। দিতে দিতে অশোক-ভাণ্ড যখন নিঃশেষ হইয়া যায়, তখন যশোধরা গৌতমের সম্মুখে আসিয়া প্রশ্ন করেন, আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছি যেজন্য আপনি অশোক-ভাণ্ড দিয়া আমার প্রতি শিষ্টাচার দেখাইলেন না ? গৌতম উত্তর দেন, শিষ্টাচার আমার বিলক্ষণ জানা আছে, কিন্তু আমি ইহাও জানিতাম তুমি আসিবে সবশেষে। এই বলিয়া তিনি নিজের অঙ্গুলী হইতে অঙ্গুরীয়টি খুলিয়া তাঁহার আঙ্গুলে পরাইয়া দেন। অশোক-ভাণ্ড লইতে আসিয়া যশোধরা পান গৌতমের হাতের আংটি।

কিন্তু হইলে কি হয়, শাক্যরা ছিলেন জাতি হিসাবে অতিমাত্র গর্ব্বিত, কুলের সংস্কারে তাঁহাদের মন সমাচ্ছন্ন। যশোধরার পিতা ও শাক্যজ্ঞাতিরা শুদ্ধোদনের এ প্রস্তাবে সম্মত হন না। মেয়ে তাঁহারা দিবেন না। শুদ্ধোদনের পুত্র রূপবান বটে, কিন্তু বিদ্যা ? ধনুর্ব্বিদ্যা, মল্লক্রীড়া প্রভৃতি পুরুষোচিত বিদ্যায় কিছুমাত্র নৈপুণ্য আছে নাকি তাঁহার ? বিবাহ করিয়া স্ত্রীকে রক্ষা করিবেন কি করিয়া ? সুতরাং শাক্যকুলের কন্যা তাঁহার হাতে কি করিয়া সম্প্রদান করা যায় ?

কথাটা ক্রমে গৌতমের কানেও যায়। রাগে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ

কাঁপিয়া, ফুলিয়া, জ্বলিয়া উঠে। মেয়ে তাঁহারা দিবেন না? কোনও বিদ্যাই নাই তাঁহার?

ইহার সপ্তম দিবসে কপিলবাস্তু নগরে এক বিরাট জনসভায় সমস্ত শাক্যদিগকে আহ্বান করিয়া সমুপগত সকলের সম্মুখে শাক্যসিংহ বলিষ্ঠ দেহে তাঁহার ক্রীড়া-কৌশল প্রদর্শন করেন। দেখিয়া শাক্যদের যেমন বিস্ময়ে চক্ষু হয় স্থির, তেমনই মনে হয় আনন্দ। ইহার পর তাঁহার হস্তে কন্যা দান করিতে কোনও আপত্তিই কাহারও থাকিতে পারে না।

বিবাহের পর তের বৎসর ধরিয়া যশোধরা সুখে স্বামীর ঘর করেন। ইতিমধ্যে ধীরে ধীরে গৌতমের মনে কেমনতর এক পরিবর্ত্তন আসে, যাহার রূপ দেখা যায় না, কিন্তু ছায়া স্পষ্ট। মুখের কালি গাঢ়তর হইয়াই চলে। ঘটনাক্রমে তাঁহার দৃষ্টিপথে ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুর দৃশ্য পতিত হয়ই, না হওয়ার জন্য তাঁহার পিতার সমস্ত প্রচেষ্টাই নিয়তি ব্যর্থ করিয়া দেয়। এই দুঃখ-ভরা সংসার তাঁহার আর লেশমাত্র ভাল লাগে না। কি করিয়া সকল দুঃখের অতীত হওয়া যায় এবং দুঃখের কারণের উচ্ছেদ সাধন করা যায়, তাহাই তখন তাঁহার একমাত্র চিন্তা, যখন গৌতম ঊনত্রিশ বৎসরের যুবা মাত্র। সেই সময় একদিন, সেদিন আষাঢ়ের পূর্ণিমা তিথি, গৌতম দেখেন এক সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর শান্তশ্রী দেখিয়া আর সন্ন্যাস-জীবনের আনন্দ-লহরীর কথা শুনিয়া তিনি তৃপ্তি পান গভীর, অপার। তাঁহার মনে হয় তিনি সত্যকারের পথের সন্ধান পাইয়াছেন। ভাবিতে ভাবিতে তিনি গিয়া বসেন দিনশেষে তাঁহাদের রমণীয় উদ্যানের সরসীর ধারে।

সেখান হইতে প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে তিনি সংবাদ পান, যশোধরার একটি পুত্র জন্মিয়াছে। আবার নূতন এক মায়ার বন্ধনের কথা শুনিয়া গৌতম তৎক্ষণাৎ স্থির করেন, আর নয়, এবার তাঁহাকে সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া নিজের পথে চলিতে হইবে, যে পথে সকল দুঃখের অতীত হওয়া যায় এবং দুঃখের কারণের উচ্ছেদ সাধন করা যায়। ধীরে ধীরে তিনি প্রাসাদে প্রবেশ করেন। সেখানে তাঁহার উদাসী মন রঞ্জনের জন্য নৃত্য-গীত প্রভৃতি বিবিধ প্রমোদের বহুতর আয়োজন ছিল, কিন্তু এ সকল তখন তাঁহার নিকট বিষের চেয়েও তিক্ত। তিনি শয্যায় গিয়া নিদ্রামগ্ন হন। অর্দ্ধ-রজনীতে যখন নিদ্রাভঙ্গ হয়, তখন দেখেন ঘুমের ঘোরে সবাই অচেতন। তাঁহার নির্দ্দেশে বাহিরে সারথি ছন্দক তাঁহার প্রিয় অশ্ব কণ্ঠককে লইয়া প্রস্তুতই ছিল। গৌতম উঠেন, কিন্তু গৃহত্যাগের পূর্ব্বে কি যেন ভাবিয়া একটিবার যশোধরার সূতিকা-গৃহের দিকে যান। দ্বারপথে দাঁড়াইয়া দেখেন, যূথিকার ফুলশয্যায় শুইয়া জননী পুত্রের মাথার উপরে নিজের পেলব বাহুলতা বিস্তার করিয়া নিরুদ্বেগে ঘুমাইতেছেন। তারপর নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কণ্ঠকের পৃষ্ঠে উঠিয়া তিনি নিষ্ক্রান্ত হইয়া যান, শুধু ছন্দক ছুটিয়া চলে তাঁহার সাথে সাথে নিরুদ্দেশ যাত্রাপথে।

আট দিন পরে ছন্দক ফিরিয়া আসে কপিলবাস্তুতে, শুধু কণ্ঠককে সঙ্গে লইয়া। তাহার মুখে গৌতমের গৃহত্যাগের সকল বিবরণ শুনিয়া কপিলবাস্তুর অধিবাসিগণ শোকে ভাসিতে থাকে, গৌতমের মাতৃস্থানীয়া বিমাতা গৌতমী মূর্চ্ছা যান, অন্যান্য

পুরমহিলাগণ উচ্চরোলে কাঁদিতে থাকেন। যশোধরার সহিতও ছন্দকের দেখা হয়। জবাফুলের মত রক্ত-রাঙ্গা দুই চোখে অজস্রধারে কত না তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া গড়াইয়া পড়িতেছে। যশোধরা প্রশ্ন করেন, তাঁহাকে কোথায় রাখিয়া আসিলে, ছন্দক? চোরের মত রাত্রিতে চুরি করিয়া লইয়া গিয়া কোন্ বনে বিসর্জ্জন দিয়া আসিলে? নতমুখে ছন্দক যতটুকু যাহা জানে বলিয়া যায়। পুনরপি যশোধরা জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কি জানেন না যে ধর্ম্মপত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মচর্চ্চা হয় না? যশোধরার আর বলা হয় না, বাষ্প আসিয়া তাঁহার কণ্ঠরোধ করে, তিনি অস্থির হইয়া পড়েন।

তারপর যশোধরা কি করেন? স্বামী সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া কাষায়-বস্ত্র পরিতেছেন জানিয়া তিনিও কাষায়-বস্ত্র পরিধান আরম্ভ করেন। স্বামী মাল্য, চন্দন প্রভৃতি ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া তিনিও বিলাসের যাবতীয় সামগ্রী, যাবতীয় প্রসাধন ত্যাগ করেন। পালঙ্ক ছাড়িয়া ভূমিশয্যায় শয়ন করিতে থাকেন। বস্তুতঃ বিধবারই মত শুদ্ধাচারে ও নিষ্ঠায় তিনি তাঁহার মেঘলা দিনগুলি কাটাইতে থাকেন।

ওদিকে বোধ্‌গয়ায় বুদ্ধত্ব-লাভের ও সারনাথে ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তনের পর গৌতম-বুদ্ধ রাজগৃহ হইতে দীর্ঘ সাত বৎসর পরে আসেন কপিলবাস্তুতে সাতদিনের জন্য। দ্বিতীয় দিন প্রভাত-বেলায় তিনি নগরের রাজপথে বাহির হন ভিক্ষার উদ্দেশ্যে। শুদ্ধোদনের প্রাসাদের সম্মুখ দিয়াও তাঁহাকে যাইতে হইবে, উহাই গমন-পথ। শুনিয়া যশোধরা গিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন

আলুথালু চুলে, অপলক চোখে, এক বাতায়ন-তলে, যদি দেখা যায়। দেখা যায়ও। পরিধানে চীবর, হস্তে ভিক্ষাপাত্র, বুদ্ধদেব শান্ত চরণ ফেলিতে ফেলিতে চলিয়া যান সেই পথ ধরিয়া, পিছনে কাতারে কাতারে অনুচর। যশোধরা বোঝেন, তাঁহার দেবতা আজ আর তাঁহার একার নয়, এখন তিনি সকলের দেবতা। যশোধরা এখন সকলের মধ্যে একজন মাত্র।

সেই দিনই আবার শুদ্ধোদনের নিমন্ত্রণে বুদ্ধ আসেন পিতৃভবনে অনুচরচয়কে সঙ্গে লইয়া। আহারান্তে তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্য অন্তঃপুরিকাগণ সকলে যান সেই স্থানে, যান না শুধু একজন। দুরন্ত অভিমানের সমুদ্র গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া তাঁহার বুকের মধ্যে এমনই তোলপাড় করিতে থাকে, যাইতে তাঁহার পা আর উঠে না। পরে বুদ্ধ নিজেই আসেন তাঁহার নিকটে। যশোধরা ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া দুইহাতে জড়াইয়া স্বামীর পা দুইখানি মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন।

কপিলবাস্তুতে বুদ্ধের অবস্থানের সপ্তম দিবসে যশোধরা তাঁহার পুত্র রাহুলকে শিখাইয়া দেন, পিতার নিকট হইতে পুত্রের প্রাপ্য উত্তরাধিকার চাহিয়া আন। তখন পুত্রকে বুদ্ধ কিছু কহেন নাই, বছর সাতেক পর তাঁহার প্রধান শিষ্য সারিপুত্রকে ডাকিয়া বলেন, রাহুলকে দীক্ষা দাও। সন্ন্যাসীর প্রদেয় আর কি থাকিতে পারে?

সেই ক্ষণে এ জন্মের মত পুত্রও যশোধরার পর হইয়া যায়। অর্থাৎ সংসারে তাঁহার যেটুকু আকর্ষণ ছিল, তাহারও সমাধি ঘটে। তখন যশোধরা স্থির করেন তিনি নিজেও গৃহত্যাগ

করিয়া ভিক্ষুণী-ব্রত গ্রহণ করিবেন। বুদ্ধ সে সময় শ্রাবস্তীতে, রাহুলও তাঁহার নিকটে। কপিলবাস্তুর দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া শেষবার তাহার লোক-জন, বাড়ী-ঘর, মাঠ-ঘাট প্রভৃতির অফুরন্ত শোভাকে চক্ষু দিয়া পান করিয়া যশোধরা চলিয়া যান শ্রাবস্তী-তীর্থে। সেখানে ভিক্ষুণীদের এক আশ্রমে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথায় দিনান্তে তাঁহার বারকয়েক স্বামী ও পুত্রকে চোখের দেখা দেখিবার সুযোগ হয়, তাহাই তখনকার দিনে তাঁহার পরম লাভ। রাহুলও আসেন মাঝে মাঝে মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে তাঁহার আশ্রমে। একবার যশোধরা আন্ত্রিক রোগে অসুস্থ হইয়া পড়িলে রাহুল শ্রাবস্তীর রাজা প্রসেনজিতের রাজোদ্যান হইতে সুপক্ক আম্র সংগ্রহ করিয়া মাতাকে দেন, তাহার রস পান করিয়া যশোধরা সুস্থ হইয়া উঠেন।

ভিক্ষুণী হইয়া যশোধরা ক্রমশঃ ক্রমশঃ সাধনার উচ্চস্তরে আরোহণ করেন। বুদ্ধের তিনি সমবয়স্কা হইয়া থাকিলে আটাত্তর বৎসর বয়সে, বুদ্ধের মহাপরিনির্ব্বাণের বছর দুই পূর্ব্বে, তাঁহার দেহাবসান হয়। মৃত্যুর কিছুকাল আগে বুদ্ধের নিকট হইতে তিনি বিদায় লইয়া আসেন, তারপর নাকি কতগুলি বিস্ময়কর শক্তির পরিচয় দিয়া তিনি লোকান্তর গমন করেন।

সুজাতা

এই পৃথিবীতে দৈবাৎ এমন এক একটা দিন আসে যেগুলি পরে অবিস্মরণীয় বলিয়া আখ্যা লাভ করিয়া থাকে। সেগুলি যেন ধাবমান কালের গতিপথ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কোনও এক বিশেষ ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া কোথাও স্থাণুর মত স্থির হইয়া থাকে, নড়ে না, চড়ে না, দোলে না, কিছুতে ঢাকাও পড়ে না। যত দিন যায়, মানুষ ততই পিছন ফিরিয়া দেখে সেই এক একটি দিন ধ্রুব নক্ষত্রের মতই আপন কক্ষে তেমনি অমলিন সত্তায় বিরাজ করিতেছে।

এমনই একটা দিন গৌতমের বুদ্ধত্ব লাভের দিন, যে দিন তাহার পূর্ব্বক্ষণে দীর্ঘদিন উপবাসের পর তিনি প্রথম আহার্য্য গ্রহণ করেন। সেদিনের কত সন, কত তারিখ, বৃদ্ধ ইতিহাস এখন আর তাহা সঠিক স্মরণ করিতে পারে না, কিন্তু ভূলোকের যাবতীয় বুদ্ধ-ভক্তের মনে সেই দিনটি তাহার জন্মগত শুচিতার ধবলতা আজিও প্রতিফলিত করে। আর সেই সঙ্গে স্মরণ করাইয়া দেয় সেই সুভগা নারী সুজাতাকেও, যিনি হাতে করিয়া দান করিয়াছিলেন গৌতমকে সেই আহার্য্য-সামগ্রী।

কাহিনী সুজাতার বড় নয়, বরং খুবই ছোট, কিন্তু ছোট বলিয়া মোটেই হেলাফেলার নয়। বৌদ্ধ-জগতে সুজাতার নাম ও কথা এক মায়া রচনা করিয়া আছে।

বিহার প্রদেশে নেরঞ্জরা বা নীলাজনা নদীর ধারে বোধগয়ার

নিকটে উরুবেলা গ্রামে থাকিতেন সেনানী নামে একজন আঢ্য ভূস্বামী, সুজাতার পিতা।

বালিকা সুজাতার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-বুদ্ধিও বাড়িতে থাকে। উরুবেলায় ছিল এক বিশাল ন্যগ্রোধ বা অশ্বত্থ বৃক্ষ, বহুদিনের স্থবির। কত কাল ধরিয়া কত ঝড়, কত প্রভঞ্জনের উন্মত্ত নৃত্য সে মাথা পাতিয়া সহিয়াছে, ভাঙ্গে নাই। কেন, যেন তাহা সকলেরই জানা। সেই বনস্পতির অধিষ্ঠাতৃ দেবতাকে স্মরণ করিয়া সুজাতা তাঁহার মুকুলিকা বয়সের আবেদনে একদিন প্রতিজ্ঞা করেন, যদি সমান মর্য্যাদার কাহাকেও তিনি পতিত্বে বরণ করিতে পারেন, আর তাঁহার কোলে যদি সর্ব্বপ্রথম আসে একটি কুমার, তবে তিনি নিজের হাতে পরমান্ন রন্ধন করিয়া সেই দেবতাকে উৎসর্গ করিবেন।

পরে ঘটে কিন্তু তাহাই। সুজাতার প্রথম সন্তানও হয় একটি পুত্র। পুষ্পিত কামনায় পুলকিতা সুজাতা তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালনে অবহিতা হন। পায়েসের জন্য ভাল দুধের সমস্যাও তিনি সমাধান করিয়া ফেলেন। এক সহস্র নধরকান্তি গরুকে দোহন করিয়া সেই দুধ খাওয়ান পাঁচ শত গরুকে। সেই পাঁচ শত গরুর দুধ খাওয়ান আড়াই শত গরুকে। সেই আড়াই শত গরুর দুধ আবার খাওয়ান সওয়া শত গরুকে। এমনি করিয়া শেষ পর্য্যন্ত খাওয়ান আটটি গরুকে, এবং তাহাদের দুধে প্রস্তুত হয় সুজাতার পরমান্ন। আকাশের দেবতারা নাকি অলক্ষ্যে সেই পরমান্নকে সিঞ্চিত করেন অমৃতে, আর পরমান্ন রন্ধনের সময় সুজাতা যে সকল অদ্ভুত ও

অলৌকিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেন, তাহাতে তাঁহার রোমাঞ্চ উপস্থিত হয়।

পরমান্ন প্রস্তুতের পর সুজাতা পাঠাইয়া দেন তাঁহার দাসী পুণ্যাকে সেই গাছতলার উৎসর্গের জায়গাটি শোধিত করিয়া আসিতে। সেই দিনই গৌতমের সমাধি শেষ হইয়াছে, তিনি নির্ব্বাণ লাভ করিয়া বুদ্ধ হইবার জন্য সেই বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া আছেন, জ্যোতিতে তাঁহার চারিদিক উদ্ভাসিত। পুণ্যা আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া আর কিছুই বোঝে না, বোঝে গাছের দেবতা পরমান্নের প্রতীক্ষায় ঐভাবে বসিয়া আছেন, এবং ছুটিয়া গিয়া সে সুজাতাকে ঐ কথাই বলে, দেবি, গাছের দেবতা গাছ হইতে নামিয়া গাছতলাতেই বসিয়া আছেন; আর চারিদিক আলোয় ভরিয়া গিয়াছে। সুজাতা প্রশ্ন করেন, সত্য ? হাঁ দেবি, সত্য।

পরম আগ্রহে সুজাতা সমস্তখানি শক্তি দিয়া চলেন সেই গাছের দিকে। হাতে তাঁহার সোনার পাত্রে সেই পরমান্ন। সেখানে পৌঁছাইয়া সোনার পাত্রটি ভূমিতলে নামাইয়া রাখিয়া ঢাক্‌নিটা তাহার খুলিয়া ফেলেন, এবং আর একটি সোনার ভৃঙ্গারে লইয়া আসেন সুগন্ধি জল। তারপর সুজাতা ধীরে ধীরে গিয়া দাঁড়ান গৌতমের পাশে। গৌতম সেই পরমান্ন গ্রহণ করেন। সোনার বাটিটা হাতে লইয়া তিনি যান নেরঞ্জরার ধারে, এবং স্নানান্তে উঠিয়া আসিয়া সেই পরমান্ন তৃপ্তিতে ভোজন করেন। উনপঞ্চাশ দিন পরে গৌতমের এই প্রথম আহার্য্য গ্রহণ। এই উনপঞ্চাশ দিন ছিলেন তিনি

একেবারে অভুক্ত। খাওয়ার শেষে তিনি সোনার বাটিটা ফেলিয়া দেন নদীর জলে, আর বাটিটা ভাসিয়া চলে স্রোতের বিপরীত দিকে। ইহাতেই নাকি বুঝা যায় সেই দিনই গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন।

ইহাই হইল সুজাতার গল্প। সুজাতা-চরিতের যাহা কিছু রূপ ও রস, যত কিছু গন্ধ, তাহা বুদ্ধত্ব-লাভের দিনে গৌতমকে এই আহার্য্য দানের মধ্যেই। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ইতিহাসে সে এক মস্ত ঘটনা। এই ঘটনা শুধু বৌদ্ধ-সাহিত্যে লেখা নয়, বৌদ্ধ-শিল্পেও পাথরের গায়ে আঁকা আছে। পরবর্ত্তী কালে সুজাতা বুদ্ধের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া উপাসিকাদের মধ্যে একজন প্রধানা হইয়াছিলেন।

কোশলদেবী

বুদ্ধ-যুগের নারী-ইতিহাস জীর্ণ মুকুর নয়। এমন বহু স্থচরিতার নানা অবদান তাহাতে প্রতিবিম্বিত। পতিপরায়ণতায় যাঁহার কথা তাহাতে উজ্জ্বলতম রেখাপাত করিয়া আছে তিনিও গোত্রহীনা, পরিচয়দীনা নারী নন। বরঞ্চ তাঁহার পরিচয়টা ছুই দিক দিয়াই শুভ্র,—একদিকে তিনি ছিলেন যুক্তপ্রদেশের কোশল-রাজ্যের রাজা প্রসেনজিতের ভগিনী, এবং অন্যদিকে মগধেশ্বর বিম্বিসারের মহিষী। ইতিহাস তাঁহাকে কোশলদেবী বলিয়া জানে। বুদ্ধদেবের সমসময়ে তাঁহার স্বামী ও ভ্রাতা উভয়েই ছিলেন প্রখ্যাত রাজা, বিপুল তাঁহাদের প্রতাপশ্রী, ও ছুইজনেই বুদ্ধের প্রতি অতিশয় ভক্তিমান।

বৌদ্ধরা বলেন, কোশলদেবীর পুত্র অজাতশত্রু, মগধের সিংহাসনের যিনি ভাবী অধিকারী। অজাতশত্রু ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে রাজ্যের গণকেরা গণিয়া বলেন, এই পুত্রই তাহার পিতার মৃত্যুর কারণ হইবে। তাহার উপর আবার সে সময়টা রাণীর প্রবল ইচ্ছা হয় তিনি রাজার দক্ষিণ হস্তের রক্ত পান করেন। ইহাও নিরতিশয় অশুভ লক্ষণ।

রাণীর ইচ্ছা অবশ্যই অপূর্ণ রাখা হয় না, কিন্তু গণকের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা শুনিয়া আতঙ্কে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে। তিনি রাজাকে অশেষ মিনতি করিয়া বলেন, মহারাজ, এই সন্তান

জাত হইবার আগেই উহাকে যে কোনও প্রকারে বিনষ্ট করুন। বিম্বিসার উত্তর দেন, তাহা হয় না।

অজাতশত্রু জন্মগ্রহণ করেন। আদর, আহ্লাদ, সোহাগ, চুম্বন কিছুরই অন্ত নাই। দিনে দিনে শিশুর বয়স বাড়ে, বয়সের সঙ্গে কলেবরও বাড়ে। রাজার আনন্দ ধরে না।

একদিন, সেদিন শিশুর কান্না আর থামিতে চায় না। দেখা গেল, তাহার হাতে একটা দুষ্ট স্ফোটক। ভাষাহীন শিশুর ক্রন্দন থামাইতে না পারিয়া শিশুর ধাত্রী অগত্যা তাহাকে লইয়া যায় রাজসভায় রাজার নিকটে। শিশুকে দেখিয়াই রাজা বিম্বিসার সভা ত্যাগ করিয়া উঠেন, ও পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া সেই ব্যথার হাতখানা মুখে লইয়া চুষিয়া চুষিয়া ফোড়াটি গালিয়া দেন, ও উহার পুঁজ সভাকক্ষে না ফেলিয়া নিজেই গিলিয়া ফেলেন।

এমনই আদরে-সোহাগে দিন যায়। পুত্র পিতৃহন্তা হইবে একথা রাজা ত বিশ্বাসই করেন নাই, রাণীও সেকথা ক্রমে ভুলিতে লাগিলেন।

এদিকে বুদ্ধের এক মামাত ভাই, অথবা শ্যালক, ছিলেন দেবদত্ত। যদিও দেবদত্ত বুদ্ধের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ও ভিক্ষুসঙ্ঘে যোগদান করিয়াছিলেন, কিছুকাল পরে বুদ্ধের প্রভাব ও সম্মানে তিনি ভিতরে ভিতরে বুদ্ধের প্রতি হিংসায় দগ্ধ হইতে থাকেন। তাঁহার মনে হয়, আমারও শাক্যবংশে জন্ম, আমিও ভিক্ষু, তবু কেন লোকে বুদ্ধের মত আমাকে খাতির করে না, আমি কিসে ছোট ? তিনি আরও ভাবেন, যাঁহাদের পোষকতার জোরে বুদ্ধ এত শক্তিশালী, এত তাঁহার তেজ ও দম্ভ, তাঁহাদের

মধ্যে বিম্বিসারই প্রধান। কাজেই বিম্বিসারকে ধ্বংস করিতে পারিলেই বুদ্ধের বিষদন্ত ভাঙ্গিয়া যায়।

অজাতশত্রু তখন বয়স্ক, সাবালক। দেবদত্ত নানাভাবে মন্ত্রণা দিয়া অজাতশত্রুকে প্ররোচিত করিতে থাকেন বিম্বিসারের বিরুদ্ধে। দেবদত্ত ও কয়েকজন সাঙ্গোপাঙ্গের সাহায্যে অজাতশত্রু সত্যই একদিন এক ষড়যন্ত্র করেন বিম্বিসারকে হত্যার মতলবে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ষড়যন্ত্রটা ধরা পড়িয়া যায়। রাজার মন্ত্রীরা পরামর্শ দেন—অজাতশত্রু, দেবদত্ত ও তাঁহাদের দলের প্রত্যেককে ধরিয়া চরম দণ্ড দেওয়া হোক্। কিন্তু বিম্বিসার তাহাতে স্বীকৃত হন না। অজাতশত্রুকে ডাকিয়া তিনি জানিতে চাহেন, তিনি কি চান। অজাতশত্রু কিছুমাত্র অনুতপ্ত না হইয়া অম্লানমুখে বলেন, চাই ক্ষমতা, চাই সিংহাসন। বিম্বিসার কোনও দ্বিরুক্তি বা দ্বিধা না করিয়া বলেন, তুমিই সিংহাসনে বস।

কিন্তু বিম্বিসারের সিংহাসন ত্যাগেও দেবদত্ত নিশ্চিন্ত হন না। তাঁহার অভিপ্রায়, ইহলোক হইতে বিম্বিসারকে অপসারণ। কিন্তু বিপদ এই, কোনও অস্ত্র দ্বারা বিম্বিসারকে হত্যা করা চলিবে না, কারণ বৌদ্ধধর্ম্ম অনুযায়ী তিনি সাধনার যে স্তরে উন্নীত হইয়াছেন, তাঁহাকে কোনও অস্ত্রাঘাত করিলে সে আঘাত ব্যর্থই হয়। অতএব বিম্বিসারকে বধের একমাত্র উপায়, তাঁহাকে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, উপবাসে রাখিয়া মারিয়া ফেলা। সেই অনুসারে দেবদত্তের আজ্ঞাবহ অজাতশত্রু বিম্বিসারকে বন্দী করিয়া এক স্বল্প-পরিসর কারাকক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। কোনও জনপ্রাণীর সেখানে প্রবেশের অনুমতি নাই, কেবল

কোশলদেবী রাজানুগ্রহে অনুমতি লাভ করেন দিনে একবার স্বামী সন্দর্শনের।

স্বামীর প্রতি অজাতশত্রুর এই মর্ম্মান্তিক নিষ্ঠুরতায় কোশলদেবীর বুক ফাটিয়া যাইতে থাকে। তিলে তিলে এইরূপ মৃত্যুর চেয়ে মরণের বীভৎসতর রূপ বুঝি আর নাই। অথচ রাজাজ্ঞার বিরুদ্ধে, নারী তিনি, কিছুই করিতে পারেন না, একান্ত নিরুপায়।

বিম্বিসারের কারাগৃহে কোশলদেবী প্রবেশ করেন, তারপর বসনের ভাঁজ হইতে একটি সোনার বাটি অতি সন্তর্পণে বাহির করিয়া উপবাস-ক্লিষ্ট রাজার হাতে দিয়া বলেন, মহারাজ, খান।

বিম্বিসার রাণীর দিকে তাকান, দেখিয়া লন নিখিল সংসারটাই তাঁহার সহিত উপহাস করিতেছে কিনা, তারপর বাটিটা ধরিয়া ঢক্ ঢক্ করিয়া এক নিঃশ্বাসে সমস্তটুকু খাবার খাইয়া ফেলেন।

দিন কয়েক এমনি করিয়া যায়, তারপর একদিন রাণী আসেন, কিন্তু তাঁহার কাপড়ের ভাঁজ হইতে বাটি আর বাহির হয় না। রাজা রুদ্ধকণ্ঠে কহেন, রাণি, বুঝিয়াছি, তুমি ধরা পড়িয়া গিয়াছ। রাণী উত্তর দেন, হাঁ মহারাজ, ধরাই পড়িয়া গিয়াছি, কিন্তু আপনি নিরাশ হইবেন না, আমার মাথার এই মুকুটটা খুলুন দেখি।

শীর্ণ, দুর্ব্বল হস্তে কাঁপিতে কাঁপিতে বিম্বিসার কোশলদেবীর মাথার মুকুট খুলিয়া দেখেন, মুকুট-ভরা খাদ্য। রাজা আর একটুও দেরী না করিয়া মহা আনন্দে সেটুকু নিঃশেষে খাইয়া ফেলেন।

এমনি করিয়া দিনকতক যায়, তারপর একদিন রাণী আসেন, কিন্তু মাথায় তাঁহার মুকুট নাই। রাজা মুখ ফিরাইয়া বলেন, দুঃখ করিও না রাণি, চেষ্টা তুমি করিয়াছিলে, কিন্তু আমারই ভাগ্যদোষে তুমি পার নাই।

রাণীর দুই চোখ দিয়া তখন শ্রাবণের ধারার মত জল পড়িতে থাকে, বাধা আর মানে না। তারপর তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া, মাথা নত করিয়া রাণী তাঁহার পায়ের উপানৎ হইতে খানিকটা খাদ্যবস্তু বাহির করিয়া রাজাকে দিয়া কহেন, মহারাজ, ঘৃণা করিও না, আজ এই খাও।

মগধের ভূতপূর্ব্ব অধীশ্বর তাহাই খান। একদিন যে তিনি এই অজাতশত্রুরই হাতের ফোড়ার পূঁজ গলাধঃকরণ করিয়াছিলেন, আজ সেই কথাটাও বুঝি তাঁহার স্মরণ হয়। একদিন যে তিনি অ-জাত পুত্রকে যেমন করিয়াই হোক্ মারিয়া ফেলিতে বলিয়াছিলেন, সেই কথাটাও বুঝি কোশলদেবীর স্মরণ হয়।

কয়েকটা দিন এমনি ভাবে যায়, তারপর একদিন রাণী আসেন, কিন্তু পায়ে তাঁহার কোনও আচ্ছাদন নাই। যে আশায় গত রাত্রি হইতে বিম্বিসার একটি একটি করিয়া প্রতিটি মুহূর্ত্ত গণিতেছিলেন, সে আশা সহসা যখন এমন নির্ম্মম আঘাতে চূর্ণ হইয়া যায়, তখন তিনি তাঁহার রক্তহীন, কঙ্কালসার দেহখানি তাঁহার মলিন শয্যায় এলাইয়া দেন।

রাণীর মুখ দিয়া আজ আর কোনও কথাই ফোটে না, রাণী শুধু ধীরে ধীরে গিয়া বসেন রাজার গা ঘেঁসিয়া। রাজা আড়ষ্ট

জিহ্বায় কোশলদেবীকে দুঃখ করিতে নিষেধ করিয়া কোনও রকমে বলেন, কোশলদেবী, ইহাই আমার ভাগ্যলিপি।

কোশলদেবীর আঁখিতে সেদিন আর জল নাই, ঝরিয়া ঝরিয়া সমস্ত জল শুকাইয়া গিয়াছে। তিনি শুধু গভীর মমতায় দুই হাতে স্বামীকে উত্তোলন করিয়া শয্যায় বসাইয়া চুপিচুপি বলেন, শোন, গায়ে আমি মধু মাখিয়া আসিয়াছি, জিভ দিয়া তাহাই চাটিয়া চাটিয়া খাও।

বিম্বিসার জিভ দিয়া রাণীর হাত, মুখ, বুক, পিঠ চাটিতে থাকেন।

এমনি করিয়াও দিন কয়েক যায়। তারপর একদিন সকাল যায়, দুপুর যায়, বিকাল যায়, রাণী আসেন না। একদিন, দুইদিন, তিনদিন কাটিয়া যায়, রাণী আসেন না। বিম্বিসার বুঝেন, রাণীর আর আসা হইবে না। এ জন্মের মত কোশল-দেবীর সঙ্গে তাঁহার দেখাশুনার পালা সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে।

কারাগৃহের মধ্যেই মহারাজ বিম্বিসার এধার-ওধার পায়চারি করেন, আর বায়ু সেবন করেন। তাহাতেই তাঁহার জীবন-প্রদীপটি কোনও রূপে জ্বলিতে থাকে। বড় কষ্ট।

কিন্তু সেদিন কয়েদ ঘরের দরজা খোলে কে? রাজা দেখেন, কে এক ব্যক্তি ঢুকিতেছে, বুঝি রাজবাড়ীর নাপিত। আনন্দে রাজার বুক ভরিয়া উঠে। চুলে, দাড়িতে হাত দিয়া দেখেন, সেগুলি মস্ত মস্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহা হইলে, অজাতশত্রু এতক্ষণ নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়াছে। তাঁহাকে মুক্তি দিবার আগে নাপিত পাঠাইয়া দিয়াছে, ক্ষৌরকার্য্য করিয়া তাঁহাকে পরিষ্কার

পরিচ্ছন্ন করিয়া দিতে। তাহা হইলে, এইবার বিম্বিসারের যন্ত্রণার অবসান হইবে, আর পেট ভরিয়া তিনি দুটো খাইতে পাইবেন। রাজার বুকে আনন্দ আর ধরে না।

নাপিত আসিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে নিজের কাজটি করিয়া যায়। বিম্বিসারের পা দুখানি টানিয়া লইয়া ঘচ্ ঘচ্ করিয়া পায়ের শিরাগুলি তীক্ষ্ণ ক্ষুর দিয়া কাটে, তারপর কাটা ঘায়ে নূন ছিটাইয়া দেয়, আর বেশ করিয়া জায়গাটা জ্বলন্ত অঙ্গার দিয়া পোড়াইয়া দেয়। অস্ত্রে যাঁহার মৃত্যু নাই, তিনি যেন ঘরের মধ্যে পায়চারি করিয়া করিয়া আর বাঁচিয়া থাকিতে না পারেন।

নিজের কাজ সারিয়া নাপিত চলিয়া যায়। মরণ আগেই আসিয়া শিয়রের কাছে দাঁড়াইয়াছিল, বিম্বিসার আর দেরী না করিয়া মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িয়া বাঁচেন।

সেই দিনই অজাতশত্রুর একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ছেলের মুখ দেখিয়া তাঁহার মহা আনন্দ। আর সেই সঙ্গে তাঁহার মনে হয়, তাঁহার নিজের জন্মের দিনে তাঁহার বাবার বুকেও এতখানিই আনন্দ হইয়াছিল।

সেই দিনই নয়, কয়েকটা দিন পরে, মহারাণী কোশলদেবী স্বামীকে খুঁজিতে স্বর্গলোক যাত্রা করেন।

জৈনরা বলেন, কোশলদেবী অজাতশত্রুর মাতা নন, বিমাতা। কিন্তু তাহা হইলেও, সেজন্য কোশলদেবীর পতিপরায়ণতার আখ্যান নিঃস্ব হইয়া কাঁদিয়া মরে না, যাহা থাকে তাহাই লইয়া তাহার মাধুরীর অন্ত নাই।

সঙ্ঘমিত্রা

ইতিহাস যখন ত্যাগের এই রাণীটির কথা বলে, মনে হয় দূর হইতে বাতাসে ভাসিয়া-আসা একটি মৃদু সৌরভের মতই তাঁহার স্মৃতিটি স্নিগ্ধ ও মধুর। বাস্তবিকই, ত্যাগের দেশ ভারতেও ত্যাগ সঙ্ঘমিত্রার চরিত্রকে এমন সুষমায় মাখিয়া রাখিয়াছে যে তাহার তুলনা বিরল। কালের ধু ধু প্রান্তরে যত মানুষের যত সুকীর্ত্তির ও শুভবৃত্তির স্তম্ভ প্রোথিত রহিয়াছে, আত্মত্যাগের স্তম্ভগুলি তাহার মধ্যে সমুন্নত, ইহাদের মধ্যেও আবার সঙ্ঘমিত্রার মত কাহারও কাহারও ত্যাগের স্তম্ভ যেন আরও ঊর্দ্ধগগনে গিয়া ঠেকিতেছে। তাহার কারণ, ত্যাগেরও স্তরভেদ আছে। সমস্ত-খানি ভোগের স্পৃহা চরিতার্থ হওয়ার পর যে ত্যাগের জন্ম, অথবা ভোগবিলাসের উপকরণ যেখানে অপ্রতুল সেখানে যে ত্যাগ আত্মপ্রকাশ করে, তাহার চেয়ে বিপুল বৈভব বা অপ্রতিম বিত্তকে ভোগের প্রারম্ভেই স্বেচ্ছায় পায়ে ঠেলিয়া দেয় যে ত্যাগ, তাহা উচ্চস্তরের। সঙ্ঘমিত্রার ত্যাগ শেষ পর্য্যায়ের। তাঁহার কিসের দুঃখ ছিল? কিসের তিনি কাঙ্গাল ছিলেন? ইচ্ছা করিলেই ত তিনি সারাটা জীবন কত রাশি রাশি সম্পদ, কত সুখ, কত হাসি, কত গান, কত আলো, কত উৎসব, কত খেলা ও করতালির মধ্য দিয়া কাটাইতে পারিতেন, কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই। এই সমস্তই, এমন কি সাধের জন্মভূমিও পড়িয়া থাকে পিছে, তিনি শুধু নিজেকে লইয়া আগাইয়া চলেন ত্যাগের

পথে, মঙ্গলের প্রদীপ হাতে লইয়া, তরুণ বয়সে। এই যাত্রা-পথে তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করে দুই দিক হইতে দুই শক্তি, বাহির হইতে তাঁহার ধর্ম্ম এবং তাঁহার ভিতরের রক্ত।

সঙ্ঘমিত্রার ধমনীতে যে রক্ত-প্রবাহ ছিল, তাহা দেবতাদের প্রিয়, প্রিয়দর্শী, মহারাজ অশোকের। সেই পুণ্যশ্লোক রাজ-রাজেশ্বর অশোক, যিনি কলিঙ্গ-যুদ্ধের পর তৃপ্তিহীন ভোগকে বিসর্জ্জন দিয়া শ্রান্তিহীন সেবাকে গ্রহণ করেন, অপ্রমেয় রাজ-শক্তিকে কল্যাণের দাসত্বে নিয়োজিত করেন, গৌতম-বুদ্ধের ধর্ম্মকে সর্ব্বপ্রথম রাজধর্ম্মের মর্য্যাদা দেন, আর গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, আমার সমস্ত প্রজা আমার নিজের সন্তান, —তাঁহারই আত্মজা সঙ্ঘমিত্রা। প্রথম যৌবনেই সঙ্ঘমিত্রা পিতার এই রাজধর্ম্মকে বরণ করিয়া তাঁহার রক্তের শক্তির সহিত ধর্ম্মের শক্তির অচ্ছেদ্য আলিঙ্গন ঘটান।

অশোকের সিংহাসন লাভের দশ এগার বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ বিন্দুসারের রাজত্বকালের কথা। স্থির হইল, আঠার বৎসরের কুমার অশোককে যাইতে হইবে অবন্তীতে উপরাজ হইয়া, সেই প্রদেশের শাসনভার ও কর-সংগ্রহের অধিকার লইয়া। পাটলিপুত্র হইতে অবন্তীর রাজধানী উজ্জয়িনী বড় কমখানি পথ নয়, কাজেই যাওয়ার পথে স্থানে স্থানে শিবিকা নামাইতে হয় যাত্রিকের বিশ্রামার্থে। এইরূপে যাইতে যাইতে মধ্য-ভারতের তখনকার সমৃদ্ধ নগরী বিদিশায় বা বেদিশগিরিতে পৌঁছাইয়া অশোক সেখানে কিছুদিন অবস্থান করেন। গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত ভিল্‌সা নামক যে স্থান অশোক-স্তূপের জন্য এখনও

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ, তাহারই প্রাক্তন নাম বিদিশা। সেখানে যাঁহার ভবনে অশোক আতিথ্য গ্রহণ করেন, তিনি দেব নামে একজন শ্রেষ্ঠী, জাতিতে বৈশ্য, কিংবা দীর্ঘদিন আগে কপিলবাস্তু হইতে পলাইয়া-আসা এক শাক্য-পরিবার-সম্ভূত ক্ষত্রিয়। দেবের কন্যা দেবী, যেন রূপসাগরে ডুব দিয়া এই উঠিয়াছেন। সেই রূপলক্ষ্মীকে দেখিয়া মুগ্ধ অশোক তাঁহাকে বিবাহ করিয়া লইয়া যান উজ্জয়িনীর প্রাসাদে। কিন্তু দেবী অশোকের একজন দেবী অথবা মহাদেবী হইলেন, বলা দুরূহ। বিবাহের প্রথম বৎসরে দেবী মহেন্দ্র নামে এক পুত্রের মা হন। তাহার দুই বৎসর পরে (আনুমানিক ২৮২—২৮১ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে) উজ্জয়িনীতে তাঁহার কোল আলো করিয়া মহেন্দ্রের একটি বোন আসে, তাহার আগের কি নাম জানি না, পরের নাম সঙ্ঘমিত্রা।

বছর দশেক অবন্তীর উপরাজ থাকার পর, পিতার গুরুতর অসুস্থতার সংবাদ অশোককে ত্বরিত গতিতে পাটলিপুত্রে লইয়া আসে। সেই সময় দেবীকে বিদিশায় তাঁহার পিত্রালয়ে তিনি রাখিয়া যান, কিন্তু নিজের দশ বৎসরের তনয় ও আট বৎসরের তনয়াটিকে সঙ্গছাড়া করিতে পারেন নাই। পিতার মৃত্যুর পর অশোক, হয় এক অথবা একশত বৈমাত্রেয় ভ্রাতার রক্তগঙ্গা ঠেলিয়া, না হয় রাজামাত্যদের নির্ব্বাচনের জোরে, পাটলিপুত্রের সিংহাসনে বসেন। তাঁহার সিংহাসনে আরোহণ ও অভিষেক-ক্রিয়ার মধ্যে চারি বৎসরের একটা দীর্ঘ ব্যবধান থাকার কথা সত্য হইলে, অশোকের রাজ্যাভিষেকের সময় সঙ্ঘমিত্রার বয়স হইয়াছিল বার বৎসর।

যথাসময়ে অশোক তাঁহার দুহিতার বিবাহ দেন তাঁহার নিজের ভাগিনেয় অগ্নিব্রহ্মার সহিত। কিছুকাল যায়, সঙ্ঘমিত্রা নিজেও একটি পুত্রের জননী হন, তাহার নামকরণ হয় সুমন। কিন্তু ইহার পরেই সঙ্ঘমিত্রার ভাগ্যচক্র যায় ঘুরিয়া। ভাগ্যবিধাতা তাঁহার জীবনের নূতন অধ্যায় লিখনে মন দেন।

রাজা হইয়া অশোক যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন তাঁহার সহোদর তিষ্য বা তিস্‌সকে। কিছুদিন পর রাজ্যের মধ্যে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের জয়জয়কার আরম্ভ হয়, দলে দলে লোক ধর্ম্মের বাণী শোনে ও তাহার শরণ গ্রহণ করিয়া সংসার-ত্যাগী ভিক্ষু হইয়া যায়। এমন সময়ে একদিন তিষ্য বলেন, আমি আর যুবরাজ থাকিতে পারিব না, ধর্ম্ম আমাকে ডাক দিয়াছে। তখন অশোক প্রস্তাব করেন অগ্নিব্রহ্মাকে যুবরাজ হওয়ার জন্য। অগ্নিব্রহ্মা সবিনয়ে নিবেদন করেন, তাঁহার পক্ষেও ইহা সম্ভবপর নয়, কারণ তিনিও ধর্ম্মের আহ্বানে সাড়া দিয়াছেন।

অশোক স্বয়ং তাঁহার অভিষেকের নবম বৎসরে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া গৃহী উপাসক হন। কিন্তু প্রথম এক বৎসর ধর্ম্মের উন্নতি বিধানে তিনি প্রযত্ন করেন নাই। তারপর দেড় বৎসর ধরিয়া তিনি 'সঙ্ঘে উপগত' হন, অর্থাৎ সম্ভবতঃ সঙ্ঘের সহিত বাস করেন। সিংহলের ঐতিহ্যে এক কাহিনী রহিয়াছে যাহার এই সময়ের ঘটনাবলীর সহিতই সঙ্গতি রক্ষা করা যায়। প্রধান প্রধান ধর্ম্মাচার্য্যের সমক্ষে একদিন অশোক প্রশ্ন করেন, বুদ্ধের উদ্দেশ্যে দান বেশী কাহার? তাঁহারা একবাক্যে উত্তর দেন, আপনার; বুদ্ধ বাঁচিয়া থাকিতেও তাঁহার প্রতি এত দান আর

কেহই করেন নাই। তখন অশোক কহেন, তাহা হইলে আমি এই ধর্ম্মে অংশ গ্রহণ করার উপযুক্ত বিবেচিত হইতে পারি কিনা? আবার সমস্বরে উত্তর হয়, না, না, না। বিস্মিত অশোক জিজ্ঞাসা করেন, যদি এত দানেও আমার এই অধিকার জন্মিয়া না থাকে, তবে তাহা কাহার? বিনা কুণ্ঠায় বৌদ্ধাচার্য্যগণ উত্তর দেন, মহারাজ, যিনি নিজের পুত্র ও কন্যাকে ভিক্ষুসঙ্ঘে যোগ দিতে দেন, সে অধিকার তাঁহারই, তিনিই শুধু এই ধর্ম্মের সর্ব্ববিধ সুযোগ-সুবিধা ভোগের অধিকার দাবী করিতে পারেন, তিনিই শুধু বুদ্ধের শাসনাবলীর 'দায়াদ' বা উত্তরাধিকারী হইতে পারেন। অশোক তখন মুখ ফিরাইয়া পুত্রকে প্রশ্ন করেন, মহেন্দ্র, তুমি ভিক্ষু হইতে রাজী? দ্বিধা বা দ্বিরুক্তি না করিয়া মহেন্দ্র জানান, তিনি সম্পূর্ণ রাজী। সঙ্ঘমিত্রাও তখন সেখানে উপস্থিত। তাঁহাকেও অশোক ঐ একই প্রশ্ন করেন, মা, তুমি রাজী? সঙ্ঘমিত্রাও তৎক্ষণাৎ ঐ একই উত্তর দেন, হাঁ, বাবা, রাজী। ঠিক এই ঘটনাটি যদি বা না হয়, এই রকমই কোনও এক ঘটনা সঙ্ঘমিত্রার ভিক্ষুণী হইবার মূলে থাকিবারই কথা। যেদিন হইতে ধর্ম্ম প্রাচীর তুলিয়া তাঁহার ও তাঁহার স্বামীর মধ্যে বিচ্ছেদের আড়াল সৃষ্টি করে, সেইদিন হইতে সঙ্ঘমিত্রা এই পথরেখাই খুঁজিতেছিলেন, এবং তাঁহার যৌবনের প্রারম্ভেই তাঁহার জীবনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হয়। নূতন খাতে সঙ্ঘমিত্রার জীবনপ্রবাহ বহিতে থাকে।

ভিক্ষু হওয়ার পর মহেন্দ্র রাজপ্রাসাদে আর থাকিতে পারেন না, এজন্য পাটলিপুত্রের উপকণ্ঠে অশোক তাঁহার বাসের জন্য

এক প্রকাণ্ড বিহার নির্ম্মাণ করাইয়া দেন, তাহার নাম অশোকারাম। ভিক্ষুণী হইয়া সঙ্ঘমিত্রাও পাটলিপুত্রেই কোথাও বাস করিতে থাকেন, রক্তাম্বর পরিধান করিয়া আর ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া। মহেন্দ্রকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা দেন মৌদ্‌গলী-পুত্র তিষ্য, যিনি উপগুপ্ত নামে এবং অশোকেরও গুরু বলিয়া খ্যাত। আর সঙ্ঘমিত্রা দীক্ষা গ্রহণ করেন ধর্ম্মপালা নাম্নী আচার্য্যার নিকট হইতে। দীক্ষার সময় মহেন্দ্রের বয়স কুড়ি, আর সঙ্ঘমিত্রার আঠার বলিয়া কথিত।

এদিকে আবার, খৃষ্টপূর্ব্ব ২৫৩ বা ২৪৭ অব্দে, সিংহলের যিনি রাজা হন, তাঁহার নামও তিষ্য, এবং তিনিও অশোকের মতই 'দেবতাদের প্রিয়' বলিয়া নিজের পরিচয় দিতে থাকেন। পরের বৎসর তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্রের অধীনে তিনি পাটলিপুত্রে অশোকের সভায় এক দৌত্য প্রেরণ করেন, কি না কয়েকজন যোগ্য বৌদ্ধাচার্য্যকে যাইতে হইবে সিংহলে, সেই দ্বীপে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে। সঙ্ঘাধিনায়ক মৌদ্‌গলী-পুত্র তিষ্যের নির্দ্দেশে অশোক এই শুভ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পাঠান যোগ্যতম হিসাবে মহেন্দ্রকে। মহেন্দ্রের সঙ্গী হন অপর চারিজন ভিক্ষু আর সঙ্ঘমিত্রার শিশুপুত্র সুমন। এখন আর সুমন সঙ্ঘমিত্রার কে? সাত বৎসর বয়সের সময়ই নাকি সুমনও সঙ্ঘে যোগ দিয়া সঙ্ঘমিত্রার কোল হইতে নামিয়া গিয়াছে। সদলে মহেন্দ্র জ্যৈষ্ঠ মাসে সিংহলে উপস্থিত হইলে রাজা তিষ্য পরম সমাদরে মহেন্দ্র প্রভৃতিকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যান রাজধানী অনুরাধপুরে। অবিলম্বে তিষ্য নিজে ধর্ম্ম ত গ্রহণ করেনই, তাছাড়া তাঁহার

দেশের সহধর্ম্মিগণের ব্যবহারের জন্য মহামেঘবন নামক তাঁহার নূতন চমৎকার উদ্যানটি দান করিয়া দেন।

মহেন্দ্রের সফল প্রচারে সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম দ্রুত ছড়াইয়া পড়ে। ইতিমধ্যে তিষ্যের ভ্রাতৃবধূ অনুলা রাজ-ভবনের পাঁচ শত অপর মহিলার সহিত মহেন্দ্রের মুখে পর পর দুই দিন ধর্ম্মের ভাষণ শুনিয়া দীক্ষার জন্য পাগল হইয়া তিষ্যকে দিয়া মহেন্দ্রকে অনুরোধ করেন। মহেন্দ্র অসম্মত হন। বলেন, নারীকে দীক্ষা দেওয়ার অধিকার তাঁহার নাই, একাজ করিতে পারেন তাঁহার ভগিনী সঙ্ঘমিত্রা।

অতএব সঙ্ঘমিত্রাকে সিংহলে আনয়নের জন্য উদ্যোগ আয়োজন চলে। অরিষ্ট নামে তিষ্যের অপর এক ভ্রাতুষ্পুত্র পাটলিপুত্রে এইবারকার দৌত্যের নেতৃত্ব করিবেন। মহেন্দ্র ইঁহাদের বলিয়া দেন বোধ্‌গয়ার বোধিদ্রুমের একটি শাখাও যেন সঙ্ঘমিত্রার সহিত সিংহলে আনা হয়। অরিষ্ট ও তাঁহার দল যথাসময়ে পাটলিপুত্রে উপনীত হন, এবং যথাসময়ে সঙ্ঘমিত্রা শোনেন তাঁহাকে যাইতে হইবে। হোক্। ইহাতে তাঁহার আর হৃদয়ের মানা কি থাকিতে পারে? তিনি ত আপনার বলিতে যেখানে যাহা কিছু ছিল, যাহা কিছু প্রিয়, যাহা কিছু কাম্য, যত কিছু আদরের, সবই পরার্থের যূপকাষ্ঠে বলি দিয়াছেন, তবে আর যেখানে হোক্, যতদূরেই হোক্, যাইতে তাঁহার ভয়ই কিসের, ভাবনাই কিসের? মনে মনে তিনি সকলের কাছে বিদায় চাহিতে থাকেন—বিদায় পাটলিপুত্র, বিদায় বিদিশা, বিদায় পিতা, বিদায় স্বামী, বিদায় জীবন-পথের সকল সাথী। বিদায়ের

দিনে, মাথার উপর দায়িত্বের যে সমুদ্র লইয়া তিনি পারসমুদ্রে চলিয়া যাইতেছেন, তাহার পরিপূর্ণ সার্থকতা কামনা করিয়া রাজর্ষি অশোক শুচিস্মিতা নন্দিনীকে এ জন্মের মত শেষবার বক্ষের মধ্যে টানিয়া লইয়া আবেশ-ভরে তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া মনে মনে কি যেন বলেন। আদি বোধিদ্রুম হইতে উৎপন্ন নব বোধিবৃক্ষের ডানদিকের একটি শাখা সঙ্গে লইয়া সঙ্ঘমিত্রা আরও একাদশ জন ভিক্ষুণী সহ অগ্রহায়ণ মাসে পাটলিপুত্রের ঘাটে নৌকায় আরোহণ করেন। সেদিন অশোকের পিতৃহৃদয় বাধা মানে নাই, তিনিও নৌকায় আরোহী হইয়া বসনে। ভাগীরথীর স্রোতে স্রোতে তরী ছুটে দক্ষিণ-পশ্চিম বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ বন্দর তাম্রলিপ্তি অভিমুখে। সেখানে ভারতের মাটি ছাড়িয়া সঙ্ঘমিত্রার তরী সমুদ্রে পাড়ি দেয়। দিক্‌চক্রবালে তরী মিশিয়া গেলে অশোক পাটলিপুত্রে ফিরিয়া আসেন। সঙ্ঘমিত্রা ও তাঁহার সঙ্গিনীগণ নিরাপদে পৌঁছান সিংহলের জম্বুকোলা বন্দরে। মহারাজ তিষ্য তাঁহার সম্বর্দ্ধনার কোনও ত্রুটি করেন নাই, সসম্ভ্রমে তাঁহাকে ও তাঁহার অনুচরীগণকে, এবং রাজোচিত সমারোহে শোভাযাত্রা করিয়া বোধিদ্রুমের শাখাটিকে, লইয়া তিনি যান অনুরাধপুরে। শাখাটি মহামেঘবনে রোপণ করা হয়। দীক্ষা-লাভ না করা পর্য্যন্ত অনুলা ও তাঁহার সহচারিণীগণ রাজপ্রাসাদ ছাড়িয়া একটি স্বতন্ত্র আশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন, পরে যাহা উপাসিকা-বিহার নামে খ্যাত হয়। রাজধানীতে সঙ্ঘমিত্রার আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া অনুলা লঘুপদে ছুটিয়া আসেন তাঁহার নিকটে, আর সকলেও আসেন। তাঁহাদের দীক্ষায় বিলম্ব ঘটে না।

অনুরাধপুরে সঙ্ঘমিত্রার বাসের জন্য ঐ উপাসিকা-বিহার নির্দ্দিষ্ট হয়। রাজা তিষ্য ভিক্ষুণীদের থাকিবার জন্য আরও বারটি বিহার নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। চল্লিশ বৎসর রাজত্বের পর মহারাজ তিষ্য পরলোকগমন করিলে, তাঁহার এক ভ্রাতা, উত্রিয়, সিংহলের সিংহাসনে বসেন। এই উত্রিয়েরই রাজত্বের অষ্টম বর্ষে মহেন্দ্র দেহত্যাগ করেন, আর পর বৎসরই (আনুমানিক ২০৪ বা ১৯৯ খৃঃ পূঃ) সঙ্ঘমিত্রাও লোকান্তরিতা হন বলিয়া লেখা আছে। রাজাজ্ঞায় সমগ্র সিংহলে এক সপ্তাহ ধরিয়া শোকোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বোধিবৃক্ষকে অভিমুখ করিয়া স্তূপারাম-উদ্যানের পূর্ব্বদিকে তাঁহার পার্থিব দেহকে চিরশায়িত করা হয়। এই স্থানটি নাকি সঙ্ঘমিত্রারই নিজের নির্ব্বাচন। সিংহলীয় বৃত্তান্ত অনুসারে, মৃত্যুর সময় সঙ্ঘমিত্রার বয়স ঊনষাট, কিন্তু অশোকের রাজ্যাভিষেকের বার বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার জন্ম হইয়া থাকিলে এই সময় তাঁহার বয়স দাঁড়ায় প্রায় আশী বা চুরাশীতে। সিংহলের ঐতিহ্যের কালনির্দ্দেশে গলদ অনেক।

সেই যে সঙ্ঘমিত্রা তাম্রলিপ্তি দিয়া চলিয়া যান, আর তিনি ভারতের ভূমিতে পদার্পণ করেন নাই। সিংহলের নারীজাতির পারত্রিক কল্যাণের জন্য তাঁহার জীবনের মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ ও সায়াহ্ন তিনি উৎসর্গ করেন। নিজের ঐকান্তিক যত্নে ও উদার আগ্রহে সেই বিদেশে যে ভিক্ষুণী-সঙ্ঘ কল্যাণ হস্ত দিয়া তিনি গড়িয়া তোলেন, তাহা একদিকে নারীর সংগঠন-শক্তির মঞ্জু নিদর্শন, অন্যদিকে তাঁহার জীবনের এক মহৎ কীর্ত্তি। উত্তরকালে অবশ্য সিংহলীয় ভিক্ষুণী-সঙ্ঘের অস্তিত্ব খর্ব্ব হইয়া যায়, কিন্তু

সঙ্ঘমিত্রার যুগে ভিক্ষুণীদের প্রভাব ও মর্য্যাদা আশাতিরিক্ত পরিসরে বিস্তার লাভ করে। তাহার মূলে ছিল এই নিবেদিতার আত্মত্যাগ। অশোক-লিপিতে সঙ্ঘমিত্রার নাম নাই, গন্ধ নাই, এই তর্কে তাঁহার সমস্ত কীর্ত্তিসুদ্ধ তাঁহার ইতিহাস-গত সত্তা বস্তুহীন বুদ্‌বুদের মত মিথ্যার শূন্যগর্ভে ফাটিয়া পড়ে না।

রাজ্যশ্রী

প্রাচীন ভারতের আর একজন নারী, জীবন-প্রভাতে সব কিছু পাইয়াও বাকী জীবন-ভোর তাঁহাকে না-পাওয়ার মধ্যেই কাটাইতে হয়। তবে তাঁহার এই রিক্ততা ত্যাগের-দেওয়া সোনার মুকুট নয়, দুর্ভাগ্যের বহিয়া-আনা অভিশাপ। পাইয়াও হারানোর দুঃখ বড় দুঃখ, কোথাও তাহার সীমারেখা আঁকিয়া দেওয়া যায় না। কিন্তু অন্তরের যে শক্তিতে এই সীমাহীন দুঃখকেও জীবনের মধ্যে বরণ করিয়া লওয়া যায় এমন ভাবে যে, দুঃখ আর তখন দুঃখ বলিয়া মনে হয় না, সে শক্তির প্রচণ্ডতাও অপরিসীম। এই নারীরও সে শক্তি ছিল। নাম তাঁহার রাজ্যশ্রী।

বাণভট্ট নামে একজন দেশী পণ্ডিত ও হুয়েন-সাং নামক একজন বিদেশী শ্রমণ রাজ্যশ্রীর নাম ও কথা নিরবধি কালের জন্য ইতিহাসের স্মৃতিপটে মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার তরুণ বয়সের দেদীপ্যমান দিনগুলিকে কেমন করিয়া দুর্ভাগ্যের রাহু আসিয়া গ্রাস করিয়া ফেলে, বাণের কাহিনী সেই পর্য্যন্ত। এই নারীর বাকী জীবনটা যেন নিদাঘের একখানি একটানা প্রান্তর, রুক্ষ, ঊষর, উত্তপ্ত। ছায়া নাই, জল নাই, তৃণ নাই, শোভা নাই। যেন শুধু ঝরা পাতা, আর তাহার মর্ম্মর ধ্বনি। বুকের মধ্যে আশা, আকাঙ্ক্ষা ও বাসনার দল বিশীর্ণ, বিমর্ষ গাছগুলির মতই দাঁড়াইয়া, যেন বায়ুভরে হেলিতে দুলিতেও পারে না। এই প্রান্তর-ভূমিতে চলার পথে রাজ্যশ্রীর পাথেয় ছিল দুই। একটি

তাঁহার ভ্রাতার স্নেহ, অনাবিল ও অপর্য্যাপ্ত, এবং সারাপথ গণ্ডূষ ভরিয়া এই স্নেহরস পান করিতে পাইয়াছিলেন বলিয়াই রাজ্যশ্রীর অন্তরের শক্তি শুকাইয়া যাওয়ার অবকাশ পায় নাই। হুয়েন-সাং-য়ের লেখার মধ্যে একাধিক স্থানে এই নিরুপম স্নেহের সন্ধান পাওয়া যায়। অপর পাথেয়টি তাঁহার ধর্ম্ম, যাহা মণি-কবচের ন্যায় পথের দুই পাশে কালনাগের মত প্রলোভনের দংশন হইতে রক্ষা করে মানুষকে।

রাজ্যশ্রীর পিতা পূর্ব্ব-পাঞ্জাবের স্থাণ্বীশ্বরের বা থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বা পুষ্পভূতি বংশীয় মহারাজ প্রভাকরবর্দ্ধন, নামান্তর প্রতাপশীল। প্রভাকরবর্দ্ধনকে শুধু মহারাজ বলিলে ভুল হয়, তাঁহার উপাধি ছিল মহারাজাধিরাজ। কারণ তিনিই তাঁহার বাহুর জোরে আশেপাশের কতকগুলি রাজাকে তাঁহার করদ বা সামন্ত নৃপতিতে পরিণত করিয়া পুষ্যভূতিদের ক্ষুদ্রায়তন রাজ্যটিকে একটি ছোটখাট সাম্রাজ্যের রূপ দেন।

রাজ্যশ্রী যখন ভূমিষ্ঠ হন, তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধনের বয়স বছর ছয়েক এবং কনিষ্ঠ অগ্রজ হর্ষেরও বয়স দুই হইতে তিন বছর। কন্যা বলিতে বাপ-মায়ের এই একটিই, কাজেই অশেষ আদরের। রাজ্যশ্রীর ক্রীড়াসখীগণ ছিল সকলেই নৃত্য-গীত ও নানা সুকুমার কলায় বিদগ্ধা, তাহাদের সহিত বর্দ্ধমান পরিচয়ে তিনি ধীরে ধীরে বয়সেও বাড়িতে থাকেন। ক্রমে সে দিনের দৃষ্টিতে তাঁহার বিবাহের বয়স হয়, এবং তাঁহার রূপ ও গুণের খ্যাতি শুনিয়া অনেক রাজা দূত পাঠাইয়া তাঁহার পাণি প্রার্থনা করিতে থাকেন।

একদিন রাজা প্রভাকরবর্দ্ধন অন্তঃপুর-প্রাসাদের ছাদে দাঁড়াইয়া। শুনিতে পান কে এক জন পথ দিয়া গান গাহিয়া যাইতেছে, কন্যা পিতৃগৃহে বড় হইলে পিতাকে ধর্ম্মে পাতিত করে। শুনিয়া রাজা পরিজনদিগকে বিদায় দিয়া পার্শ্বে স্থিতা রাণী যশোমতীকে বলিলেন, দেবি, রাজ্যশ্রীর এখন বয়স হইয়াছে। তাহার চিন্তা পলকের জন্যও আমার মন হইতে সরে না। তাহাকে লাভের জন্য উৎসুক হইয়া অনেক বরই দূত পাঠাইতেছেন, ইহাদের অন্য গুণ যাহাই থাকুক, বিচক্ষণ পিতা জামাতার কুলকেই বেশী করিয়া দেখেন। তুমি জান, মৌখরি নামে সারা ভুবনের বন্দিত এক বংশ আছে, সেই বংশের তিলক অবন্তিবর্ম্মা। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম গ্রহবর্ম্মা, পিতার চেয়ে সে কম গুণাঢ্য নয়, সেও একজন প্রার্থী। তোমার সম্মতি হইলে আমি তাহার হস্তেই রাজ্যশ্রীকে দান করিতে পারি।

স্বামীর কথায় দুহিতা-স্নেহে কাতর রাণীর চোখে জল আসে। তিনি বলেন, আর্য্যপুত্র, মায়েরা ত কন্যাদের ধাত্রী মাত্র, উপমাতা, শুধু তাহাদের লালন-পালন করার কাজে লাগে। কন্যাদানে পিতার মতই মত।

রাণীর সম্মতি পাইয়া রাজা তখন দুই কুমারকে ডাকাইয়া কথাটা জ্ঞাপন করেন। তারপর এক শোভন দিন দেখিয়া রাজা সমগ্র রাজকুলের সমক্ষে কন্যার প্রার্থনায় গ্রহবর্ম্মার প্রেরিত প্রধান দূতপুরুষের হাতে কন্যাদান-জল ঢালিয়া দেন। সে ব্যক্তি কৃতার্থ হইয়া চলিয়া যায়।

বিবাহের দিন আসন্ন হইতে থাকে। বিবাহের বর্ণনাটি

যেমন বিশদ, তেমনই জমকাল। রাজভাণ্ডার হইতে দীয়মান তাম্বুল, পট্টবাস, কুঙ্কুম ও পুষ্পে সর্ব্বলোক অলঙ্কৃত। দেশবিদেশ হইতে তক্ষক, তন্তুবায়, নাপিত, রজক, চর্ম্মকার, সূত্রধার প্রভৃতি শিল্পিসার্থকে ডাকা হয়। রাজসেবকদের অধীনে দলে দলে গ্রাম্যজনেরা প্রয়োজনীয় উপকরণ-সম্ভার বহিয়া আনিতে থাকে। সামন্তরাজাদের নিকট হইতে বিবিধ উপহার আসে। নিমন্ত্রিত বন্ধুবর্গকে অভ্যর্থনা জানাইতে রাজার প্রিয়জনগণ ব্যস্ত। বিবাহ-পদ্ধতি অনুসারে উদূখল, মুষল, শিলা প্রভৃতি উপকরণ ছাগদুগ্ধে সিক্ত পঞ্চ অঙ্গুলি দিয়া সুধাচূর্ণে চিত্রিত করা হয়। রাজপ্রাসাদের বাহিরের প্রকোষ্ঠগুলি নানাদিক হইতে আগত চারণদলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। সেকালে কন্যার বৈধব্য নিরাকরণের উদ্দেশ্যে ইন্দ্রাণী-পূজার পদ্ধতি ছিল, সেই হেতু পূজা-মণ্ডপে ইন্দ্রাণীর মূর্ত্তি স্থাপিত হয়। সূত্রধারগণ বিবাহ-বেদী রচনা আরম্ভ করিয়া দেয়। রাজমিস্ত্রিগণ মইয়ে চড়িয়া রাজপ্রাসাদের রাস্তামুখী প্রাচীরগুলির শিখরদেশে চূণপ্রলেপ দিতে থাকে। রাজপুরীর আঙ্গিনাটি যৌতুকের জন্য আনীত হাতী ও ঘোড়ার যেন এক সমুদ্র। অন্যত্র, দলবাঁধিয়া দৈবজ্ঞেরা লগ্নাদির গুণাগুণ গণনায় ব্যাপৃত। নগরীর ক্রীড়া-সরোবরগুলি মকরমুখী নল দিয়া গন্ধ-জলে পূর্ণ। হেমকারদের সুবর্ণ অলঙ্কার নির্ম্মাণের শব্দে বারান্দার কক্ষগুলি প্রতিধ্বনিত। চতুর চিত্রকরগণ মঙ্গলচিত্র অঙ্কনে রত। কুম্ভকারগণ মৃন্ময় মৎস্য, কূর্ম্ম, মকর, আর নারিকেল ও পানের লতা নির্ম্মাণে ব্যস্ত। এমন কি, করদ রাজারা পর্য্যন্ত প্রভাকরবর্দ্ধনের আদেশে

কোমরে কাপড় জড়াইয়া সিন্দূর-প্রস্তরে নির্ম্মিত লাল মেঝেগুলি মসৃণ করা, বিবাহ-বেদীর স্তম্ভগুলিকে উত্তোলন করা প্রভৃতি নানাবিধ সজ্জাকর্ম্ম সাধনে ব্যাপৃত।

সকালবেলা হইতে সামন্তরাজাদের সুরূপা, সুবেশা, সধবা রাণীরাও কপালে সিন্দুর পরিয়া দলে দলে আসেন, এবং বর ও বধূর গোত্রের উল্লেখ করিয়া মঙ্গল-গীত গাহিতে থাকেন। অথবা বহুবিধ বিলেপনে আঙ্গুল লিপ্ত করিয়া গলার মঙ্গলসূত্র চিত্রিত করেন; অথবা সাদা মঙ্গল-কলস ও কাঁচা শরাগুলি পত্রলতায় চিত্রিত করিয়া নিজেদের অঙ্কন-নৈপুণ্য দেখান; অথবা লাবণ্য বৃদ্ধির জন্য বলাশনা নামক গুল্মের নির্য্যাস ও কুঙ্কুমের কল্ক দিয়া ঘন অঙ্গরাগ এবং মুখালেপ প্রস্তুত করেন; অথবা কক্কোল-ফল ও জাতী-ফল দিয়া, মধ্যে মধ্যে কর্পূরের খণ্ডে খচিত, লবঙ্গ-মালা রচনা করেন। রাজপ্রাসাদ ক্ষৌম, কার্পাস, রেশমী, মাকড়সার তন্তুজ প্রভৃতি নানাবিধ সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ বস্ত্রে আচ্ছাদিত হয়, ও রঙ্গের বাহারে সহস্র সহস্র ইন্দ্রধনুর মত চারিদিক ঝলসিত করিতে থাকে।

রাণী যশোমতী একজন হইলেও, সেদিন তাঁহার ব্যাকুল হৃদয় বহুধা বিভক্ত। তাঁহার অন্তরে স্বামী, কুতূহলে জামাতা, স্নেহে কন্যা; তাছাড়া নিমন্ত্রিতা স্ত্রীগণের উপচার আছে, পরিজনদের প্রতি আদেশ দেওয়া আছে, কৃত ও অ-কৃত কাজগুলির দেখাশুনা আছে, আবার মহোৎসবের আনন্দও আছে। রাজারও তাহাই। একদিকে তিনি জামাতার নিকট বারংবার উষ্ট্র, অশ্ব প্রভৃতি উপঢৌকন স্বরূপ প্রেরণ করিয়া

তাঁহাকে আনন্দিত করেন, এবং অন্যদিকে পরিজনেরা তাঁহার আজ্ঞা পরিপালনে তৎপর হইলেও, নিজেই তাঁহার দুই পুত্রকে লইয়া যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করেন।

এইরূপে, এত আড়ম্বর ও উৎসবের মধ্যে, শুভক্ষণে গোধূলি-লগ্নে গ্রহবর্ম্মার সহিত রাজ্যশ্রীর পরিণয় সম্পন্ন হয়। শাস্ত্রীয় বিধি, স্ত্রী-আচার, যৌতুক-দান, কিছুরই কোথাও ত্রুটি হয় নাই, সবই নিখুঁত ও রাজোচিত। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই দেখা যায়, রাজ্যশ্রীর জীবনে এ সবই ব্যর্থ হইয়াছে। ইন্দ্রাণী-পূজা নিষ্ফল হইয়াছে, গণকের গণনা ভুল হইয়াছে, গুরু-পুরোহিতের আশীর্ব্বাদ মিথ্যা হইয়াছে!

বিবাহের পর রাজ্যশ্রী কনৌজে পতিগৃহে চলিয়া যান। কিছুদিন যায়, প্রভাকরবর্দ্ধন একদিন বহু সৈন্য-সামন্ত সমেত রাজ্যবর্দ্ধনকে পাঠাইয়া দেন উত্তরাভিমুখে হূণদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য। এই দলের সহিত কিছুদূর পর্য্যন্ত হর্ষও যান। কিন্তু রাজ্যবর্দ্ধন আরও উত্তরে কৈলাস পর্ব্বতের অভিমুখে রওনা হন, হর্ষ আর অধিক দূর না গিয়া হিমালয়ের সানুদেশে দিনকয়েক মৃগয়ায় অতিবাহিত করিতে থাকেন। ইতিমধ্যে হর্ষ স্বপ্নে দেখেন, এক দাবানলে সমস্ত আকাশ রক্তিম, তাহার মধ্যে এক সিংহ দগ্ধ হইতেছে, আর সিংহী তাহার শাবকদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সেই আগুনে ঝাঁপ দিতেছে। এই দুঃস্বপ্নে হর্ষের মন এক ভাবী অজানা অমঙ্গলের আশঙ্কায় সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠে। আশঙ্কা মিথ্যা হয় নাই, পরের দিনই সংবাদ পান তাঁহার পিতা গুরুতর পীড়িত। তীরবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া হর্ষ চলিয়া আসেন

থানেশ্বরে, এবং দেখেন পিতা অন্তিম শয্যায়। অগ্রজকে রাজধানী প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য হর্ষ অবিলম্বে দূত পাঠাইয়া দেন। আসন্ন বৈধব্য বুঝিয়া রাণী যশোমতী চিতাশয্যায় প্রাণ বিসর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্পা হইয়াছেন, হর্ষ অনেক বুঝাইয়াও মাতাকে টলাইতে পারেন নাই। রাজ-অমাত্যদের নানা পরামর্শ দিয়া, পুত্রকে প্রবোধ দিয়া ও আলিঙ্গন করিয়া যশোমতী পদব্রজে সরস্বতীর তীরে যান। সেখানে বিরাট এক অনল-কুণ্ড লীলাভরে জ্বলিতেছিল, রক্তোৎপলে অগ্নিকে পূজা করিয়া যশোমতী সেই অগ্নিমুখে ঝাঁপ দিয়া আগেভাগেই স্বর্গে গিয়া স্বামীর জন্য প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। বেশীক্ষণের বিচ্ছেদ নয়, ঠিক পরের দিন মহারাজাধিরাজ প্রভাকরবর্দ্ধনও পরলোক যাত্রা করেন।

মাতা নাই, পিতা নাই, জ্যেষ্ঠভ্রাতাও ফিরিয়া আসেন নাই, শোকে হর্ষের মন উতলা, বেদনায় জর্জ্জরিত। এ সকল দুঃসংবাদ কনৌজে বসিয়া রাজ্যশ্রী কখন শোনেন, বলা যায় না। হর্ষের অশৌচ-কাল অতীত হয়। কালের প্রভাবে দুঃখের বেগেও ভাটা পড়িয়া আসে। এমন সময় আসেন রাজ্যবর্দ্ধন। রাস্তার ধূলায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ধূসর। হূণ-যুদ্ধে শরবিদ্ধ দেহের নানাস্থানে সাদা পট্টিকা জড়ানো। দুই ভাইয়ের মিলন হয়। চারি চোখ বহিয়া জলধারা ছুটিতে থাকে। শোকোন্মত্ত রাজ্যবর্দ্ধন হর্ষকে রাজ্যভার দিয়া অরণ্যাশ্রমে যাওয়ার সঙ্কল্প প্রকাশ করেন। অস্ত্রবাহকের হাত হইতে নিজের অসিখানা লইয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করেন। রাজপ্রাসাদের পরিচ্ছদ-রক্ষক

আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বল্কল-বসনখানি আগাইয়া দেয়। সকলে আতঙ্কে আর্ত্তনাদ বা অন্তরাবেগে ছুটাছুটি করিতে থাকে।

কিন্তু বনে যাওয়া হইল না। সহসা সংবাদক নামে রাজ্যশ্রীর জনৈক বিশ্বস্ত ভৃত্য সজলনয়নে আসিয়া সমাচার দেয়, যেদিন প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যু-সংবাদ রাষ্ট্র হয় সেই দিনই মালবের দুষ্ট রাজা মহারাজ গ্রহবর্ম্মাকে নিহত করিয়াছে, আর মহারাণী রাজ্যশ্রীকে পদে লৌহ-শৃঙ্খল পরাইয়া কান্যকুব্জের কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। তাছাড়া, আরও জনরব, সৈন্যবাহিনীকে নায়কহীন ভাবিয়া সেই দুর্ম্মতি এই রাজ্যকেও আক্রমণ ও অধিকার করিবার উদ্যোগ করিতেছে।

সংবাদকের মুখের কথাগুলি রাজ্যবর্দ্ধন উৎকর্ণ হইয়া শোনেন। তাঁহার দেহের মধ্যে ক্রোধের বিদ্যুৎ খেলিয়া যায়। সকল শোক তিনি ভুলিয়া যান। তাঁহার ভিতরের পুরুষ-সিংহ বজ্র-ঝঙ্কারে গর্জ্জন করিতে থাকে। অনতিবিলম্বেই তিনি কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলেন। হর্ষকে বলেন, সমস্ত রাজন্য ও রণহস্তী এখানে তোমার নিকট থাকুক, মাতুল-পুত্র ভণ্ডি শুধু দশ হাজার অশ্বারোহী লইয়া আমার অনুগমন করুক। এই বলিয়া তিনি রণ-দামামা বাজাইবার আদেশ দেন।

রাজধানীতে হর্ষ একলা, নিঃসঙ্গ, যেন যূথ হইতে বিচ্ছিন্ন একটি বন্যহস্তী। সময় আর কাটে না। দীর্ঘদিন এমনই ভাবে যায়। তারপর তিনি একদিন পুনরায় স্বপ্ন দেখেন, একটি আকাশ-চুম্বী লৌহ-স্তম্ভ খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আবার তিনি বুঝিতে পারেন, আরও কোনও অকল্যাণ পাখা

মেলিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। এবং পরের দিনই সংবাদ পান, রাজ্যবর্দ্ধন হেলাভরে মালব-বাহিনীকে পরাভূত করিলেও গৌড়াধিপ (শশাঙ্ক) মিথ্যা প্রলোভনে তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদন করাইয়া নিজের ভবনে তাঁহাকে একাকী নিরস্ত্র অবস্থায় নিহত করিয়াছেন।

সর্ব্বনাশের উপর আবার এই সর্ব্বনাশ! শোকাবেগে হর্ষ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসেন, যদি কিছুদিনের মধ্যে বসুন্ধরাকে গৌড়ীয়-শূন্য না করিতে পারি, তবে আগুনে ঝাঁপ দিয়া এই পাপপ্রাণ ত্যাগ করিব, আর যতদিন তাহা না পারি ততদিন দক্ষিণ হস্ত দিয়া আহার্য্য মুখে দিব না। যুদ্ধের আয়োজন চলিতে থাকে, বিপুল সৈন্য-বাহিনী ও বিস্তর সামন্তরাজ সহ হর্ষ গৌড়-রাজ শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। পথিমধ্যে একস্থানে ভণ্ডির সহিত তাঁহার দেখা। ভণ্ডি রাজ্যবর্দ্ধন কর্ত্তৃক মালব-রাজের যাবতীয় লুণ্ঠন-লব্ধ দ্রব্য-সম্ভার সহ থানেশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। রাজ্যশ্রী সংক্রান্ত হর্ষের প্রশ্নের উত্তরে ভণ্ডি বলেন, রাজ্যবর্দ্ধন স্বর্গারোহণ করিলে গুপ্ত-নামা জনৈক অভিজাত ব্যক্তি (শশাঙ্ক) কান্যকুব্জ অধিকার করিয়াছেন, আর রাজ্যশ্রী কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তাঁহার অনুচরী-বর্গের সহিত বিন্ধ্য-পর্ব্বতের দিকে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সন্ধানে এ যাবৎ কত লোক প্রেরিত হইয়াছে, কিন্তু তাহারা কেহই ফিরিয়া আসে নাই। শুনিয়া হর্ষ বলেন, অন্য লোক দিয়া অনুসন্ধান করাইবার প্রয়োজন কি? যেখানে সে গিয়াছে, আর সব কাজ ফেলিয়া আমিও সেখানে যাইব, তুমি এই

সেনাদল লইয়া গৌড়রাজের বিরুদ্ধে অগ্রসর হও। পরদিন হর্ষ নিজের অশ্ব ও কতিপয় অনুচর লইয়া ভগিনীর সন্ধানে রওনা হন, এবং দিন কয়েকের মধ্যেই বিন্ধ্যাটবীতে উপনীত হন। অরণ্যে প্রবেশ করিয়া হর্ষ কিছুদিন ইতস্ততঃ ঘোরাঘুরি করেন, কিন্তু কোনও সন্ধানই পান না। একদিন ব্যাঘ্রকেতু নামক এক বনচর এক সঙ্গী সহ আসিয়া তাঁহাকে বলে, মহারাজ, ভূকম্প নামে এই সমগ্র বনানীর যিনি অধিপতি আমার এই সঙ্গী তাহারই ভাগিনেয়, ইহার নাম নির্ঘাত, বিন্ধ্যের প্রতিটি পাতার সহিত ইহার পরিচয়, ইহাকে বলুন, এ আপনার আদেশ পালন করিতে পারিবে। হর্ষ বলেন। নির্ঘাত উত্তর দেয়, আমি আমার লোকজন দিয়া এই পর্ব্বতের প্রত্যেকটি স্থান তন্নতন্ন করিয়া খোঁজাইতেছি, কিন্তু দিবাকরমিত্র নামে একজন পরিব্রাজক ভিক্ষু কিছু দূরে বনের মধ্যে এক আশ্রমে সশিষ্য বাস করিতেছেন, তিনিও হয়ত কিছু সংবাদ জানিতে পারেন। হর্ষের তখন স্মরণ হয়, দিবাকরমিত্র নামে পরলোকগত গ্রহবর্ম্মার এক বাল্যবন্ধু ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ যতি হইয়াছেন বটে। তাঁহাকে দর্শনের লালসায় তিনি নির্ঘাতকে লইয়া দ্রুত যান সেইখানে। দিবাকরমিত্রের তখনও যৌবন অতিক্রান্ত হয় নাই; অতি সৌম্য-দর্শন, আর বোধিসত্ত্বের মতই করুণায় চিত্ত পরিপূর্ণ। হর্ষের মুখে রাজ্যশ্রীর কথা শুনিয়া যতিবর একটু বিস্ময়ের সুরে বলেন, না, এরূপ কোনও সংবাদ ত আমার কানে আসে নাই! এমন সময় নাটকীয়ভাবে আর একজন যতি দিবাকরমিত্রের সম্মুখে শশব্যস্তে আসিয়া করজোড়ে বলেন, দেব, বড়ই পরিতাপের

কথা, এক তরুণী পূর্ব্বে ছিলেন ঐশ্বর্য্যের কোলে পালিতা, এখন দুর্ভাগ্যের প্রকোপে জীবনে হতাশ হইয়া জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন,—যদি আপনি আসিয়া সান্ত্বনার বাণীতে তাঁহাকে এখনও রক্ষা করিতে পারেন। ইহা শুনিবামাত্র হর্ষের মন ভগিনীর আশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া উঠে। ভগিনী-স্নেহে তাঁহার চিত্ত বিগলিত। চোখে অশ্রুর বন্যা। কোনওরূপে তিনি প্রশ্ন করেন, কই, কোথায়, কতদূরে? এখনও কি সে বাঁচিয়া আছে? তাহাকে কি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন সে কে, এবং কেনই বা চিতায় ঝাঁপ দিতে যাইতেছে? কি সে বলিল?

যতি নিজের উচিত ভাষায় বলেন, শুনুন, মহাভাগ, প্রত্যূষে সূর্য্যবন্দনা করিয়া নদীর সুকুমার সৈকতে বেড়াইতেছি, সেই গিরিনদীর নিকটেই এক বনলতা-গহনের মধ্য হইতে ভাসিয়া আসে নারীকণ্ঠের করুণ বিলাপধ্বনি। আমার মনে তখন সহসা দয়ার উদ্রেক হয়, আমি সেই দিকে যাই। গিয়া দেখি, একজন নারীকে পরিবৃত করিয়া রহিয়াছে অপর একদল রমণী, কুশতৃণের সূক্ষ্ম অগ্রভাগে তাহাদের পায়ের অধোভাগ বিক্ষত, সেই বেদনায় তাহাদের চক্ষু মুদ্রিত, পথশ্রান্তিতে তাহাদের পা ফুলিয়াও গিয়াছে, পথের পাথরের ঘর্ষণে পায়ের আঙ্গুল দিয়া রক্ত পড়িতেছে, ভূর্জ্জপত্র দিয়া পায়ের গোড়ালি বাঁধা, শতাবরীর কাঁটায় উরুদ্বয় বিদীর্ণ, বেণুর শাখায় পরিধেয় ছিন্নভিন্ন। মধ্যবর্ত্তিনী বনমধ্যে শায়িতা। এত বিপদেও দেহ হইতে লাবণ্য ও আভিজাত্য বিদায় লয় নাই, কিন্তু তাঁহারও পা রক্তাক্ত, মুখ বিবর্ণ, দীর্ঘায়ত উজ্জ্বল চোখ দুইটি অশ্রুতে

ঝাপ্‌সা, আকুল কেশকলাপ, কোনও আভরণ নাই, শ্বাস বহিতেছে স্থূল, কিন্তু শরীর কৃশ, বৈধব্যে দগ্ধ, যেন অসহায়তার একটি প্রতিমা। এত দুঃখেও আমাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে প্রণতা হইতে ভোলেন নাই। গভীর সহানুভূতিতে আমি তাঁহাকে কিছু বলিতে চাহিলাম, কিন্তু কি বলিব ভাবিতেছি, এমন সময়ে আর্য্যরূপা এক প্রৌঢ়া, মাথায় কতিপয় পলিত কেশ তাঁহার, ঐ নারীদল হইতে উঠিয়া আসিয়া মাথাটি ভূমিতলে স্থাপন করিয়া অশ্রুবিন্দু দিয়া আমার পা ধোয়াইতে থাকেন, এবং বলিতে আরম্ভ করেন, ভগবন্‌, যাঁহারা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন তাঁহারা সর্ব্বসত্ত্বের প্রতি অনুকম্পা দেখাইয়া থাকেন, আর বৌদ্ধরা ত সকলের দুঃখ দূর করিতে দক্ষ। তাছাড়া, যুবতীজন স্বভাবতঃই অনুগ্রহের পাত্রী, বিশেষ করিয়া যখন তাহারা বিপদে পড়ে। আমাদের এই স্বামিনী পিতার মৃত্যুতে, পতির অভাবে, ভ্রাতার প্রবাসে এবং অনপত্যতার জন্য এ সংসারে নিরালম্বা। এই মহাবন পর্য্যটন করিয়া তাঁহার সুকুমারতা নষ্ট হইয়াছে, বিপদের উপরে নূতন বিপদে হৃদয় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছে, আর যেন দারুণ দুঃখ সহিতে পারিতেছেন না, যে সকল সখীর সহিত আগে খেলাচ্ছলেও প্রণয়ভঙ্গ করিতেন না, আজ তাহাদের সকল চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া, সকল মিনতি ও কান্নাকে উপেক্ষা করিয়া, অগ্নিতে প্রবেশ করিতেছেন। তাঁহাকে রক্ষা করুন। আমি তাঁহাকে উঠাইলাম এবং ধীরে ধীরে কহিলাম, আপনি ঠিকই বলিয়াছেন, ইঁহার দুঃখ ভাষার অতীত। তবে আপনার অনুরোধ ব্যর্থ হইবে না, কেবল যদি ইঁহাকে মুহূর্ত্তকাল বাঁচাইয়া রাখিতে

পারেন। আমার গুরুদেব নিকটেই আছেন, তিনি দ্বিতীয় বুদ্ধের মতই কারুণিক। আমি গিয়া তাঁহাকে এ সকল কথা জানাইলে সেই দয়ার অবতার অবশ্যই আসিবেন এবং ইঁহাকে জ্ঞানের পথে লইয়া যাইবেন। ইহা শুনিয়া তিনি, তাড়াতাড়ি করুন আর্য্য, বলিয়া আবার আমার পদতলে পতিত হন। কাজেই আমি ছুটিয়া আসিয়া আপনার নিকট এই করুণ ব্যাপার নিবেদন করিলাম।

শ্রমণাচার্য্যের এই অশ্রুস্নাত কথাগুলির মধ্যে ভগিনীর নাম উচ্চারিত না হইলেও হর্ষের বুঝিতে কিছুই বাকী থাকে না। তখন তিনি সশিষ্য দিবাকরমিত্রকে, সমস্ত সামন্তলোক ও অন্যান্য অনুচরদিগকে সঙ্গে লইয়া সেই দিকে ধাবিত হন। নিকটে পৌঁছাইতেই শুনিতে পান, লতাবনের অন্তরাল হইতে যম, বসুধা, লক্ষ্মী, বুদ্ধ, সূর্য্য, বনদেবী ইত্যাদির ও গ্রহবর্ম্মা, প্রতাপশীল, যশোমতী, রাজ্যবর্দ্ধন, হর্ষ প্রভৃতির নাম উচ্চারণ করিয়া নারীকণ্ঠের বিলাপধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে। আরও শোনা যায়, রাজ্যশ্রীর সখীগণ মরণের পূর্ব্বে পরস্পর পরস্পরকে সম্বোধন করিয়া খেদ করিতেছে। কত সখী, কত নাম,—মোচনিকা, গান্ধারী, কলহংসী, মঙ্গলিকা, সুন্দরী, শবরিকা, সুতনু, মালাবতী, মাতঙ্গিকা, বৎসিকা, নাগরিকা, বিরাজিকা, কেতকী, মেনকা, বিজয়া, সানুমতী, ইন্দীবারিকা, কামদাসী, বিচরিকা, কিরাতিকা, কুররিকা, নর্ম্মদা, সুভদ্রা, গ্রামেয়িকা, বসন্তিকা, বিজয়সেনা, মুক্তিকা, পত্রলতা, কলিঙ্গসেনা, বসন্তসেনা, মঞ্জুলিকা, যশোধনা, মাধবিকা, কালিন্দী, মত্তপালিকা, চকোরবতী,

কমলিনী, তুরঙ্গসেনা, সৌদামিনী, কুমুদিকা, রোহিণী, লবলিকা, বামনিকা, হরিণী, প্রভাবতী, কুরঙ্গিকা ইত্যাদি।

শুনিয়া হর্ষ দ্রুতবেগে যান সেই স্থানে। গিয়া দেখেন, অগ্নিতে প্রবেশোদ্যতা রাজ্যশ্রী মোহপ্রাপ্ত হইয়াছেন। পাশে বসিয়া তিনি ভগিনীর ললাটে হাত বুলাইতে থাকেন। মূর্চ্ছায় রাজ্যশ্রীর আঁখি মুদ্রিত ছিল, স্নেহহস্তের স্পর্শে তাঁহার জ্ঞান-সঞ্চার হয়। তিনি যেন এক নূতন জীবন পাইয়া চক্ষু খোলেন। ভ্রাতার এই সময়ে আবির্ভাব তাঁহার স্বপ্নে-দেখা ঘটনার মতই মনে হয়। হর্ষের কণ্ঠ ভর করিয়া তিনি উঠিয়া বসেন। দুই চোখ দিয়া বাষ্পবারি নদী-সঙ্গমের মতই স্থূল-প্রবাহে মুক্ত হইতে থাকে, এবং জনক, জননী ও সখীগণের উল্লেখ করিয়া তিনি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠেন। হর্ষ হাত দিয়া তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরেন, এবং বলেন, স্থির হও, রাজ্যশ্রী। দিবাকর-মিত্র বলেন, কল্যাণি, ভ্রাতার কথা শোন। হর্ষের অনুচরগণ এবং রাজ্যশ্রীর পরিজনেরাও বলেন, ভ্রাতার প্রতি দয়া করুন। তবুও রাজ্যশ্রীর অবাধ্য চোখ দুইটা অনেকক্ষণ ধরিয়া বড় কান্নাই কাঁদে। তারপর ভ্রাতার সহিত ভগিনী জ্বলন্ত চিতা হইতে দূরে এক বৃক্ষতলে গিয়া বসেন। এক শিষ্য গিয়া জল লইয়া আসে, দিবাকরমিত্র সেই জল দেন হর্ষকে মুখ প্রক্ষালনের জন্য। সাদরে সেই জল গ্রহণ করিয়া হর্ষ প্রথমে ভগিনীর চোখ ধোয়াইয়া দেন, তারপর নিজের চোখও ধুইয়া ফেলেন। তখন সবাই নিস্তব্ধ, কাহারও মুখে সাড়া নাই, শব্দ নাই, যেন চিত্রে লেখা লোকের মত সকলে নির্ব্বাক, চুপচাপ দাঁড়াইয়া। হর্ষ

তখন ভগিনীকে মন্দ মন্দ স্বরে বলেন, রাজ্যশ্রী, এই আচার্য্যকে প্রণাম কর, ইনি তোমার স্বামীর দ্বিতীয় হৃদয় ছিলেন, আমাদের গুরুদেব। রাজ্যশ্রী উঠিয়া সসম্ভ্রমে দিবাকরমিত্রের পাদ-বন্দনা করেন বটে, কিন্তু স্বামীর প্রসঙ্গ উঠিতেই আবার তিনি ক্রন্দন করিতে থাকেন। দিবাকরমিত্রের কথায় হর্ষ রাজ্যশ্রীকে লইয়া উঠিয়া গিরিনদীতে গিয়া স্নান ও লৌকিক আচার পালন করেন। আর সকলেও স্নানাদি সারিয়া লন। দিবাকরমিত্রের আশ্রমে সকলের আহারান্তে, রাজ্যশ্রীর সখীদের মুখে হর্ষ রাজ্যশ্রীর সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া, ভগিনীকে লইয়া নিভৃতে বসেন গিয়া সেই গাছতলাটিতে। ধীরে যান দিবাকরমিত্র সেই স্থানে, এবং নিজের চীবর-পট্টের প্রান্ত হইতে খুলিয়া মন্দাকিনী নামে এক ছড়া অপূর্ব্ব মুক্তামালা হর্ষকে দেন উপহার। এই মালার এক ইতিহাসও আছে,—ইহা পূর্ব্বে ছিল মহাযান-শাখার প্রবর্ত্তক আচার্য্য নাগার্জ্জুনের, নাগার্জ্জুন উহা দেন তাঁহার সুহৃদ রাজা সাতবাহনকে, এবং কালক্রমে হারটি শিষ্য-পরম্পরায় দিবাকর-মিত্রের হাতে আসিয়া পড়ে। হর্ষের এই একাবলী গ্রহণের পর রাজ্যশ্রী সাহস সঞ্চয় করিয়া পত্রলতা নাম্নী তাঁহার তাম্বুল-বাহিনীকে একান্তে ডাকিয়া কানে কানে কি যেন বলেন। পত্রলেখা সবিনয়ে হর্ষকে বলেন, দেব, দেবী বলিলেন ইহার পূর্ব্বে কদাপি আর্য্যের সম্মুখে তিনি উচ্চবাক্য বলেন নাই, কিন্তু এখন হতদৈব হইয়া তাঁহার বিনয় শিথিল হইয়া গিয়াছে, কাজেই বলিতেছেন। স্ত্রীলোকের স্বামী অথবা অপত্যই জীবনের অবলম্বন, এই উভয়ই না থাকিলে জীবন ধারণ ধৃষ্টতা মাত্র।

আর্য্যের আগমনে তাঁহার মরণের চেষ্টা যখন প্রতিহত হইয়া গেল, এখন তাঁহাকে কাষায়-বস্ত্র পরিধান করিয়া বৌদ্ধ উপাসিকা হইবার অনুমতি দান করুন।

শুনিয়া হর্ষ কিছুকাল চুপ করিয়া থাকেন। দিবাকরমিত্র রাজ্যশ্রীকে অনেক সদুপদেশ দিয়া পরিশেষে স্মরণ করাইয়া দেন, অগ্রজ যাহা বলিবেন তাঁহাকে তাহাই করিতে হইবে। হর্ষ দিবাকরমিত্রের দিকে চাহিয়া বলেন, ভগবন্, আমি আমার অগ্রজের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের পুণ্যব্রত গ্রহণ করিয়াছি। আজ হইতে যতদিন পর্য্যন্ত সেই ব্রত পালন করি, আমার ইচ্ছা আমার ভগিনী ততদিন পর্য্যন্ত আমার পাশে থাকিবেন, এবং ততদিন পর্য্যন্ত আপনিও আমাদের সহিত থাকিয়া ইঁহাকে নিয়ত ধর্ম্মোপদেশ দিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিবেন। ব্রত সাঙ্গ হইলে পর আমরা উভয়েই কাষায় গ্রহণ করিব। দিবাকরমিত্র স্বীকৃত হন, এবং পরের দিন হর্ষ নির্ঘাতকে অনেক পুরস্কারে বিদায় দিয়া ভগিনী ও আচার্য্যকে লইয়া গঙ্গাতীরে স্থাপিত তাঁহার শিবিরে গিয়া উপস্থিত হন। বাণের কাহিনী এই পর্য্যন্তই।

তারপর ঠিক কবে রাজ্যশ্রীকে লইয়া হর্ষ কান্যকুব্জে আসেন তাহা জানা যায় না, কিন্তু কান্যকুব্জে গিয়া এক সমস্যা উপস্থিত হয় সেখানকার শূন্য সিংহাসনে উপবেশন লইয়া। রাজ্যশ্রী নারী, তিনি বসিতে পারেন না। গ্রহবর্ম্মার কোনও আত্মীয়কে বসাইলে রাজ্যশ্রীকে চিরটা কাল অবহেলায়, অথবা যবনিকার আড়ালে, নির্ব্বাসিতার মতই থাকিতে হইবে, ভগিনীর এই অবস্থা হর্ষ কল্পনাও করিতে পারেন না। তিনি নিজেও এই

সিংহাসনে বসিতে পারেন না, কারণ ওরূপ কোনও দাবীই তাঁহার নাই। এই সময়ে ভণ্ডির বুদ্ধিতে এই সমস্যার সমাধান হয়। ভণ্ডি রাজ্যের প্রধানদের এক সভায় আহ্বান করেন, এবং সেখানে সকলে মিলিয়া রাজা বলিয়া নির্ব্বাচন করেন হর্ষকেই। কিন্তু হর্ষের বিবেক এই আহ্বানে সাড়া দিতে কুণ্ঠা বোধ করে। তখন তিনি বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তির সম্মুখে ধ্যানে বসিয়া তাঁহার উপদেশ প্রার্থনা করেন। অবলোকিতেশ্বর বলেন, রাজ্য শাসন কর, কিন্তু মহারাজ উপাধিটি লইও না। এই জন্যই হর্ষ কান্যকুব্জের শাসক হিসাবে কুমার শীলাদিত্য নামে পরিচিত। হুয়েন-সাং ভুল করিয়া কান্যকুব্জ-সংক্রান্ত এই ঘটনাটিকে থানেশ্বরের বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু থানেশ্বরের পৈতৃক সিংহাসনে হর্ষের বসিবার জন্য রাজ্য-প্রধানদের সভাসমিতি করিয়া নির্ব্বাচনের প্রয়োজন হইবে কেন?

ফ্যাং-চি নামে একখানি চৈনিক গ্রন্থে আছে, হর্ষ তাঁহার প্রিয় ভগিনীর সহযোগে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন। সত্যই হর্ষ শাসন-সম্পর্কীয় ব্যাপারে অনেক সময় রাজ্যশ্রীর পরামর্শ ও সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকিলে তাহা আশ্চর্য্যের নয়। হুয়েন-সাং-এর বিবরণীতে দেখা যায়, গঙ্গার উত্তর তীরে রাজমহলের নিকট কজঙ্গলে হর্ষের অবস্থানের সময় মহাযান-মতের উৎকর্ষ সম্বন্ধে হুয়েন-সাং যখন হর্ষের নিকট বক্তৃতা প্রদান করেন, রাজ্যশ্রী সেই সময় হর্ষের পিছনে উপবিষ্টা ছিলেন, এবং হর্ষের মত তিনিও হুয়েন-সাং-এর বক্তৃতা ও বিচার শুনিয়া আনন্দে

উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমের পশ্চিমে তিন মাইল পরিসর সন্তোষক্ষেত্রে বা দানের মাঠে পঞ্চবার্ষিক মহামোক্ষ-পরিষদ্ নামে তিন মাস ব্যাপী উৎসবে হর্ষ তাঁহার সর্ব্বস্ব দান করিয়া ভগিনীর নিকট পুরাতন বস্ত্র চাহিয়া লইয়া তাহাই পরিয়া দশ-বুদ্ধের চরণে আত্ম-নিবেদন করেন, ইহাও হুয়েন-সাং-এরই কথা।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি হর্ষের গভীর শ্রদ্ধা থাকিলেও তিনি এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা তাহা বলা কঠিন। কিন্তু রাজ্যশ্রী সম্বন্ধে এইরূপ সংশয়ের কারণ নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া রাজ্যশ্রী সংসার ছাড়িয়া ভিক্ষুণী হন নাই, গৃহে থাকিয়াই উপাসিকা-রূপে ধর্ম্ম আচরণ করেন। হুয়েন-সাং কান্যকুব্জে এই ধর্ম্মের যথেষ্ট উন্নতি দেখিতে পান, অনেকগুলি নূতন সঙ্ঘারাম স্থাপিত হয়, ও ভিক্ষুদের বাসের জন্য বহু নূতন বিহার নির্ম্মিত হয়। এই সকলের মধ্যে রাজ্যশ্রী নিজে কোনও বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়া থাকিলে তাহা বিচিত্র নয়।

৬৪৭ খৃষ্টাব্দে হর্ষের মৃত্যু হয়। রাজ্যশ্রী কবে সংসার হইতে বিদায় লইয়াছিলেন, হর্ষের আগে কি পরে, তাহা অজ্ঞাত। তবে অনুমান হয়, হর্ষের পরেও তিনি বাঁচিয়া ছিলেন। হর্ষের মৃত্যুর পর অর্জ্জুনাশ্ব নামে তাঁহার এক মন্ত্রী বিদ্রোহ করেন ও কান্যকুব্জের সিংহাসন অধিকার করেন, ফলে হর্ষের সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া যায়। সেই সময় রাজ্যশ্রী বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহার কি দশা ঘটে, এবং তাঁহাকে কান্যকুব্জ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হয় কিনা, বলা যায় না। কেবল বুঝা

যায়, বিন্ধ্যারণ্য হইতে কান্যকুব্জে ফিরিয়া আসার পর তিনি উপেক্ষিতার জীবন যাপন করেন নাই। হর্ষের অকপট স্নেহ তাঁহাকে সেই অবাঞ্ছিত অবস্থা হইতে রক্ষা করে।

কিন্তু রাজ্যশ্রীর, ও তাঁহার মত ভাগ্যহতাদিগের, অন্তরের দৈন্য ঘুচাইবে কে? সে ক্ষমতা কাহার? ইহাদের অন্তর কি ক্ষণে ক্ষণে বিশ্ব-সংসারের সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে হাহাকার করিয়া উঠিতে চায় না? প্রতি ক্ষণে কি ইহাদের মনে হয় না, যাহা হারাইয়া গিয়াছে তাহার তুলনায় জীবনের বাকী সব কিছুই তুচ্ছ, ফাঁকি, ছলনা? কিন্তু ইহারা নিজেদের মধ্যেই শক্তি খুঁজিয়া লইয়া নিজেদের দমন করিয়া দুঃখকে দুঃখ নয় বলিয়া মনে করিতে শিখেন, তবেই বাঁচিয়া থাকেন। সে শক্তি কত প্রবল তাহা পরিমাপ করা অসাধ্য।

মধ্যযুগ

রুদ্রাম্বাদেবী

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ। আর্য্যাবর্ত্তের বৃহত্তর অংশই তখন পরাধীনতার কালিমায় আচ্ছন্ন, কিন্তু দক্ষিণ-ভারতের স্বাধীনতা-রবি তখনও পশ্চিম গগনে হেলিয়া পড়ে নাই। তখনও দক্ষিণ-ভারতের রাজ্য চতুষ্টয়, মহারাষ্ট্রের যাদব-রাজ্য, তাহার দক্ষিণ-পূর্ব্বে অন্ধ্রের কাকতীয়-রাজ্য, এই দুইয়ের দক্ষিণে দোরসমুদ্রের হোয়সল-রাজ্য, এবং তাহারও দক্ষিণে মাদুরার পাণ্ড্য-রাজ্য, নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করিতেছে, আর স্বাধীন সূর্য্যের তলে তাহাদের স্বাধীন পতাকা দুই সাগরের স্বাধীন হাওয়ার সঙ্গে রঙ্গ ভরে খেলা করিতেছে।

১১৯৮ খৃষ্টাব্দের এক দুর্দ্দিনে কাকতীয়দের যুবরাজ গণপতিকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বন্দী করিয়া লইয়া যান উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের যাদবরাজ, আর তাঁহার পিতারও হয় মৃত্যু। বছর দশেক দেবগিরিতে কারাযন্ত্রণা ভোগের পর গণপতি মুক্তিলাভ করিয়া বাড়ী ফেরেন। সেখানে দেখেন তিনি যাহা ভাবিতেছিলেন ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। এই সুযোগে অনেকগুলি সামন্তরাজ স্বাধীন হইয়া বসিয়াছে; বাহিরের অনেক শত্রুও রাজ্যটিকে আক্রমণে আক্রমণে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল, তবে তাঁহার সুযোগ্য সেনাপতি সে সব আক্রমণ যথাসময়ে ব্যাহত করিতে পারিয়াছেন, এই যা রক্ষা। প্রভুকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেখিয়া বিশ্বস্ত সেনাপতি তাঁহার রাজ্য তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হন।

তখন গণপতি এমনই পরাক্রমাঙ্ক হইয়া রাজত্ব আরম্ভ করিয়া দেন যে, কয়েক বৎসরের মধ্যেই দক্ষিণ-ভারতে কাকতীয়-রাজ্যই প্রবলতম হইয়া উঠে। বিদ্রোহী সামন্তগণ আবার বশ্যতা স্বীকার করে, আক্রমণকারিগণও নিরস্ত হইয়া যায়, পক্ষান্তরে তিনি নিজেই ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি রাজ্য জয় করিয়া, এবং বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন প্রভৃতি কূটনীতির প্রয়োগে, কাকতীয়-রাষ্ট্রের সীমানা বাড়াইয়া দেন পূর্ব্বে গঞ্জাম জেলা, দক্ষিণে নেল্লোর জেলা ও পশ্চিমে বেলারী জেলা পর্য্যন্ত।

কাকতীয়-রাজ্য শুধু আয়তনেই বাড়ে তাহা নয়, গণপতিদেবের সুশাসনে দেশ অতি সমৃদ্ধও হইয়া উঠে। বিজিত রাজ্যগুলি হইতে প্রাপ্ত অপরিমিত ধনদৌলতে দেশের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল হয়, রাজার আগ্রহে ও প্রযত্নে অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি হয়। তাছাড়া, গণপতি নানাস্থানে উৎকৃষ্ট স্থাপত্যের নিদর্শন অনেক সু-উচ্চ দেবদেউল ও রম্য সৌধের মাধ্যমে দেশকে রূপসজ্জা ও নিজেকে সৃষ্টির আনন্দ দেন, বহু জলাশয় খনন এবং আরও নানা জনহিতকর কার্য্যের দ্বারা পরকালের জন্যও পুণ্য সঞ্চয় করেন। এইরূপে তাঁহার বাহান্ন বৎসরের গৌরবের রাজত্ব শেষ হয়। শেষের আট বৎসর তিনি পুরাতন রাজধানী অনুমকোণ্ডের অদূরে নির্ম্মিত নূতন রাজধানী বরঙ্গলে অবস্থান করেন, নূতন সংস্থার সঙ্গে পুরাতন খাপ খায় না বলিয়া।

এই গণপতিদেবেরই কন্যা রুদ্রাম্বা বা রুদ্রামাদেবী। গণপাম্বা ও নাগমা নাম্নী তাঁহার অন্ততঃ আরও দুই কন্যা ছিলেন,

তাঁহাদের তিনি দুই সামন্তের সহিত বিবাহ দেন। রুদ্রাম্বারও বিবাহ হয় গণপতির এক চালুক্য-বংশীয় সামন্তের পুত্র বীর-ভদ্রেশ্বরের সহিত, কিন্তু রুদ্রাম্বার স্বামী অল্প বয়সেই মারা যান।

নিজেরও পুত্র নাই, রুদ্রাম্বারও স্বামী নাই, গণপতি রুদ্রাম্বাকেই তাঁহার বিশাল রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী মনোনীত করেন। এইজন্য তিনি তাঁহাকে হাতে কলমে জটিল রাজনীতি ও রাজ্যশাসন-পদ্ধতি শিখান। তাঁহার রাজত্বের শেষ চার বৎসর পিতা-পুত্রী সংযুক্তভাবে রাজত্ব করেন ঐ একই উদ্দেশ্যে। শোনা যায়, গণপতির মৃত্যুর পর পাছে অপুত্রা রুদ্রাম্বার উত্তরাধিকারে কোনও বৈধতার প্রশ্ন উঠে অথবা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়, এই আশঙ্কায় গণপতির নির্দ্দেশে রুদ্রাম্বা তাঁহার নিজের বছর সাতেকের দৌহিত্র প্রতাপরুদ্রকেই দত্তক গ্রহণ করেন।

১২৬১ খৃষ্টাব্দে রুদ্রাম্বা বরঙ্গলের কাকতীয় সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন চল্লিশের কিছু নীচেই তাঁহার বয়স। কিন্তু সিংহাসনে কন্যার অধিকার সুদৃঢ় করিবার জন্য গণপতির সর্ব্ববিধ সতর্কতা প্রথমেই রূঢ় আঘাত পায়, যখন গর্ব্বিত সামন্তগণ অনেকে নারীর প্রভুত্ব অস্বীকার করিয়া বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়া ধরে। তাছাড়া, এক নারীর সিংহাসনে উপবেশন আশেপাশের লুব্ধ নরপতিগণকে ও তাহাদের সামন্তদিগকে কাকতীয়-রাজ্যের বিভিন্ন অংশ আক্রমণেও প্ররোচিত করে। ইহার আগেই গণপতিদেবের বার্দ্ধক্যের সুযোগে পাণ্ড্যগণ দক্ষিণের নেল্লোর অঞ্চল কাড়িয়া লইয়াছিলেন। রুদ্রাম্বার সময়ে যে সকল বহিরাক্রমণ হয়, তাহার মধ্যে দক্ষিণ হইতে চোল-রাজ

কুলতুঙ্গের, এবং উত্তর-পশ্চিম হইতে যাদব-রাজ মহাদেবের আক্রমণই সবচেয়ে বিষম। তবে রুদ্রাম্বার নিজের দুর্দ্দম সাহস ও তাঁহার কুশলী সেনাপতিগণের তৎপরতার যোগাযোগে অচিরেই সমস্ত বিদ্রোহ যেমন প্রশমিত হয়, সমস্ত আক্রমণও তেমনই ব্যাহত হইয়া যায়। যাদববাহিনী অবশ্য বরঙ্গলের রণক্ষেত্র হইতে বহু রাজহস্তী ও রণবাদ্যযন্ত্র লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়, কিন্তু রাজ্যের সংহতি তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণা রুদ্রাম্বা প্রমাণ করেন, তাঁহার যোগ্যতা, সামর্থ্য ও রাজনৈতিক প্রতিভা পুরুষের চেয়ে কিছু কম নয়, গণপতিদেব তাঁহার মনোনয়নে কিছুমাত্র ভুল করেন নাই।

কিন্তু বাহিরে প্রমাণ যাহাই হোক্, রুদ্রাম্বার অন্তর তাঁহাকে বারে বারে বলিতে থাকে, এভাবে চলিবে না। নারীর প্রভুত্বের বিরুদ্ধে নরের চিরজন্মের পুঞ্জীভূত সংস্কারের এই যে ভয়ঙ্কর, রুদ্র অভিব্যক্তি, তাহা একবার না হয় রোধ করা গেল, দুইবারও হয়ত যাইবে, কিন্তু হয়ত তৃতীয়বার না-ও যাইতে পারে। পুরুষের আত্মম্ভরিতা উৎকট হইয়া নারীর শাসনকে যদি অনসূয়ার সঙ্গে গ্রহণ করিতে না-ই দেয়, সেই ধূমায়িত বহ্নি আগে হোক্ পরে হোক্, একদিন ঠিকই সহস্র শিখায় জ্বলিয়া উঠিয়া কাকতীয়দের সমুদয় কীর্ত্তিসুদ্ধ তাঁহাকে ভস্মসাৎ করিবে। রুদ্রাম্বার নাই স্বামী, নাই পুত্র, কাজেই একজন পুরুষ শিখণ্ডীকে সামনে খাড়া করিয়া যে পিছন হইতে তিনি শাসনের রথ চালনা করিবেন, অথবা অনুচিতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবেন, তাহারও ত উপায় নাই। সুতরাং তাঁহার অন্তরকে উত্তর দিতে গিয়া তিনি

করেন কি, নিজেই পুরুষ সাজেন—পুরুষের বেশ পরিধান করিয়া, এবং সেই হেতু পুরুষের চালচলন ও হাবভাবও কিছুটা অনুকরণ করিয়া তিনি প্রকাশ্য রাজসভায় আসিতে থাকেন, পুরুষের মতই ক্ষিপ্রতায়, পৌরুষেয় দর্পে। এমন কি, নিজের নামটিকেও বদলাইয়া তিনি গ্রহণ করেন পুরুষের নাম, রুদ্রদেব মহারাজ।

সংসারের মঞ্চে এ এক চমৎকার অভিনয়! পুরুষের ভূমিকায় অবতীর্ণা হইয়া রুদ্রাম্বা অভিনয় করেন সুন্দর, অনবদ্য। তাঁহার নারীত্বের উপর তাঁহার কোনও অভিমান, কোনও ক্ষোভ ছিল না, তাঁহার নারীজন্মকে তিনি ধিক্কারও দেন নাই, কিন্তু তাঁহার কর্ত্তব্যের পথে যখন অভিশাপ হইয়া দাঁড়ায় তাঁহার নারীত্ব, তখন দায়ে ঠেকিয়া যতক্ষণ প্রয়োজন তিনি পুরুষ সাজেন, এবং প্রয়োজন ফুরাইলেই নারী হন।

বরঙ্গলে রুদ্রাম্বার সিংহাসনে আরোহণের মাত্র কুড়ি বাইশ বৎসর আগে দিল্লীর সিংহাসনে বছর তিনেকের জন্য সুলতানা রজিয়কেও অনেকটা অনুরূপ অভিনয় করিতে হইয়াছিল। রজিয় পুরুষের নাম গ্রহণ করেন নাই, অতখানি তিনি অগ্রসর হইতে পারেন নাই, কিন্তু অবগুণ্ঠন ত্যাগ করিয়া, পুরুষের মত 'কুল্যা' (উঁচু টুপি) মাথায় দিয়া, পুরুষের মত 'কবা' (লম্বা অঙ্গরাখা) পরিয়া তিনি প্রকাশ্য দরবারে রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেন, এবং দিবালোকেই অশ্ব বা গজারোহণে নগর ভ্রমণে বাহির হইতেন। দশম শতকের শেষে কাশ্মীরের কুখ্যাতা রাণী দিদ্দাও কতকটা ইহার দৃষ্টান্তস্থল। রাজশক্তিকে করায়ত্ত রাখিবার জন্য তিনি কত কি-ই করিয়াছেন, তাহার মধ্যে তাঁহার পুরুষোচিত

ভাবভঙ্গী এমনই উগ্রভাবে প্রকট হইয়া উঠিত, অনেকে ভুলিয়াই গিয়াছিল তিনি রাণী, তাঁহাকে বলিত 'রাজা' দিদ্দা।

যাহা কিছুদিন আগে রজিয়কে লইয়া যায় ধ্বংসের পথে, রুদ্রাম্বাকে তাহাই আনিয়া দেয় জীবনের সার্থকতা। রুদ্রাম্বা, রুদ্রদেব-মহারাজ হইয়া রাজ্যের আভ্যন্তরীণ উন্নতির দিকে অবহিতা হন, শাসনের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির দিকে মন ঢালিয়া দেন। যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়া রাজ্যের শান্তি নষ্ট করা তাঁহার ঈপ্সিত ছিল না। শান্তির প্রতি এই একনিষ্ঠতাই তাঁহাকে দীর্ঘ রাজত্বকালে অন্ধ্ররাজ্যের সীমানা কোনও দিকে আর প্রসারিত করিতে দেয় নাই। পিতার নিকট হইতে শাসনতান্ত্রিক যে শিক্ষা ও দীক্ষা তিনি পান, ও পিতার শাসন-সংক্রান্ত পরিবেশের মধ্যে থাকিয়া যে অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা তিনি অর্জ্জন করেন, তাহাই এখন সর্ব্বতোভাবে প্রজার কল্যাণের উদ্দেশ্যে তিনি বিবিধ গঠনমূলক কার্য্যে প্রয়োগ করিতে থাকেন। পিতার আমলের প্রাচীন ও প্রবীণ অমাত্যগণের জাগ্রত দৃষ্টি ছিল তাঁহার সকল কার্য্যের উপর, যেন আগে ভুল করিয়া বসিয়া পরে তাঁহাকে অনুতাপ না করিতে হয়। রাজপুরুষগণের কাহাকেও কোথাও কখনও কোনও সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে শুনিলেই তিনি তাঁহার সাহায্য-হস্ত বাড়াইয়া দেন তাহার সমাধানে। বাহিরে পুরুষ সাজিলেও অন্তরে তিনি অহরহ সেই নারীই ছিলেন, নারী-হৃদয়ের কোমলতা কিছুমাত্র উৎসারিত হয় নাই। কত মন্দির স্থাপন, কত সরোবর খনন, কত ছায়াতরু রোপণ, কত দরিদ্রভরণ তাঁহার জনকল্যাণের

সাক্ষ্য বহন করিতে থাকে, তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রজানুরঞ্জনের এত সমারোহ-ভার বিনিময়ে তাঁহাকে এমনিই জনপ্রিয়তা আনিয়া দেয় যে, পরিশেষে দেখা যায় তেমন জনপ্রিয়তা কাকতীয় বংশের আর কেহই দাবী করিতে পারেন না। অন্ধ্রদেশের জনশ্রুতি বলে, তাঁহার প্রতি অবিমিশ্র অনুরাগে প্রজাগণ তাঁহার নামানুসারে অম্বালা নাম দিয়া অনেকগুলি গ্রাম স্থাপন করে।

কথিত আছে, রুদ্রাম্বার শাসন গণপতিদেবের সুশাসনকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। ইহা রুদ্রাম্বার অনুগৃহীত কোনও চাটুকারের কথা নয়; একথা বলিয়া গিয়াছেন তাঁহার সম-সাময়িক একজন নিরপেক্ষ বিদেশী পর্য্যটক—মার্কো পোলো। বিদেশী বলিয়া মার্কো পোলো রুদ্রাম্বার সহিত গণপতির সম্পর্কে লজ্জাকর ভুল করিয়া বসিয়াছেন, তাঁহার ধারণায় তিনি গণপতির রাণী, কিন্তু রুদ্রাম্বার ন্যায়পরায়ণতা, সমদৃষ্টি ও শান্তিপ্রিয়তার যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা তিনি করিয়া গিয়াছেন তাহা দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে এমন অক্ষরে লেখা আছে যাহার দাগ মুছিবার নয়। ঐ বংশের অন্য যে কোনও রাজা বা রাণীর অপেক্ষা রুদ্রাম্বাই প্রজাবর্গের হৃদয় সমধিক জয় করিয়াছিলেন, ইহাও মার্কো পোলোরই উক্তি। কাকতীয়-রাজ্য বহু পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেও এই রাজ্যের যথার্থ রূপ দেন গণপতিদেব, আর তাহারই সচেতন প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন রুদ্রাম্বা। প্রজার সদিচ্ছা ও আনুগত্যের উপর যে সিংহাসনের প্রতিষ্ঠা, সেই বজ্র-কঠিনের আর বিদ্রোহীর হাতে ভাঙ্গার ভয় কি?

ত্রিশ বৎসর রাজত্বের পর পথশ্রান্তা রুদ্রাম্বা তাঁহার দৌহিত্র প্রতাপরুদ্রকে সিংহাসন ছাড়িয়া দিয়া অবসর গ্রহণ করেন। তারপর আরও পাঁচ বৎসর তিনি পৃথিবীর বায়ুতে বাঁচিয়া থাকেন। তিনি যেমন দীর্ঘদিন তাঁহার পিতার নিকটে রাজনীতি শিক্ষা করেন, তিনিও তেমনি দীর্ঘদিন ধরিয়া প্রতাপরুদ্রকে নিজের সান্নিধ্যে রাখিয়া তাঁহার রাজনৈতিক পাঠ সম্পূর্ণ করিয়া দেন। নূতন রাজধানী বরঙ্গলের চারিদিকে একটি শৈল-প্রাচীর গঠনের সূত্রপাত করিয়াছিলেন গণপতি, রুদ্রাম্বা তাহাকে শুধু সমাপ্তই করেন নাই, তাহার বহির্দ্দেশ ঘিরিয়া আর একটি মাটির প্রাচীরও তিনি নির্ম্মাণ করেন। শৈল-প্রাচীরের পরিধি ছিল প্রায় দেড় মাইল, আর মৃৎপ্রাচীরটি ছিল দুই মাইল বিস্তৃত বরঙ্গলের আয়তনকে পরিবেষ্টন করিয়া। কেন দূরদর্শিনী রুদ্রাম্বা একাজে হাত দেন তাহা বুঝা যায় তাঁহার মৃত্যুর ছয় বৎসর পরেই, ১৩০২ খৃষ্টাব্দে, আলাউদ্দীন খল্‌জীর সেনাপতি ফক্‌রুদ্দীন জানার কাকতীয়-রাজ্যের উপর প্রথম নিষ্ফল অভিযানের সময়। কিন্তু ১৩০৯ খৃষ্টাব্দে এই দুই প্রাচীরও বরঙ্গলকে রক্ষা করিতে পারে নাই। একদা যেমন হিন্দুর এক কলঙ্ক অম্ভি আলেকজাণ্ডারকে সিন্ধু অতিক্রমের গোপন পথের সন্ধান দিয়া মহাবীর পুরুকে বিপন্ন করাইয়াছিলেন, তেমনই ১৩০৯ খৃষ্টাব্দে হিন্দুর আর এক কলঙ্ক যাদব-রাজ রামচন্দ্র মালিক কাফুরকে শুধু বরঙ্গলের সীমানা পর্য্যন্ত নিরাপদে পৌঁছাইয়া দিয়াই নয়, অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য এবং বিস্তর অর্থ ও খাদ্যাদি দিয়াও, বীরবাহু প্রতাপরুদ্রের সর্ব্বনাশ

ঘটাইলেন। কাফুরের সৈন্যের অবিরাম প্রস্তর নিক্ষেপে আগে মাটির প্রাচীরটি পথ করিয়া দেয়, তারপর দুর্ভেদ্য শৈল-প্রাচীরও। কাফুর বরঙ্গলে ঢুকিয়া রুদ্রাম্বার সার্থক অভিনয়ের যাহা কিছু সঞ্চয় সবই সেদিন প্রতাপরুদ্রের শিথিল মুষ্টি হইতে কাড়িয়া দিল্লী লইয়া যান, কাকতীয় ইতিহাসের উপরে সেই দিনই যবনিকাপাত হয়।

মীরাবাঈ

মধ্যযুগে ভারতীয় সাধনার ক্ষেত্রে যে সকল ভক্ত প্রেম দিয়া ভগবানকে জয়ের অভিযানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন মীরাবাঈ নারী হইলেও তাঁহাদের একতম। তিনি নূতন কোনও ধর্ম্ম-মতেরও প্রবর্ত্তন করেন নাই, কোনও অভিনব ধর্ম্মসম্প্রদায়েরও প্রতিষ্ঠা করিয়া যান নাই, শুধু নিজের সমস্তখানি সত্তা দিয়া নিজের জীবন-দেবতার সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগ সাধনেই তিনি ছিলেন উন্মুখ। ইহা ছাড়া তাঁহার জীবনের আর কোনও ব্রত ছিল না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, সেই দেবতার সহিত তাঁহার সম্পর্ক শুধু আজ বা কালের নয়, তাহা চিরন্তন, যতদিন ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে। তিনি বিশ্বাস করিতেন, তাঁহার দেবতা তাঁহার হৃদয়াসনেই অবস্থান করেন, তাঁহাকে অন্যত্র খোঁজাখুঁজি করিয়া বেড়ানও ভুল, এবং তাঁহাকে পাওয়ার জন্য কঠোর তপশ্চর্য্যায় দেহকে পীড়া দেওয়ারও কোনও মানে হয় না। তিনি আরও বিশ্বাস করিতেন, দেবতার যে বিগ্রহকে তিনি পূজা করিতেন, সেই বিগ্রহের মধ্যেই দেবতা রহিয়াছেন, এবং দেবতা ও তাঁহার মূর্ত্তি একই।

মীরার দেবতা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। বৃন্দাবনের সেই বালক কৃষ্ণ, যিনি সেখানে গরু চরাইতেন, বাঁশী বাজাইতেন, হাতে গোবর্দ্ধন-গিরি ধারণ করিয়াছিলেন, এবং রাধা ও অন্যান্য গোপীদের সহিত খেলা করিতেন। মীরা তাঁহাকে ডাকিতেন নানা নামে,—গোপাল,

গিরধর (গিরিধারী), গিরিধর-গোপাল, গিরধর-নাগর, নন্দলাল ইত্যাদি। কখনও কখনও আবার হরি, শ্যাম, রাম, রঘুবর—এই সব বলিয়াও। দিনের কাজকর্ম্ম সারা করিয়াই মীরা অনবরত তাঁহার দেবতার নামকীর্ত্তনে রত হইতেন, কারণ দেবতার সহিত ভক্তের যোগাযোগ রক্ষার সহজতর উপায় আর কই? তাছাড়া, তিনি দেবতার বিগ্রহের সম্মুখে যখন তখন নৃত্য করিতেন, ও গান গাহিতেন, নৃত্যের তালে তালে ও গানের সুরের মধ্য দিয়া দেবতাকে আকর্ষণ করিতে। গান মীরার এত প্রিয় ছিল যে, মনে হয় তাঁহার সারা জীবনটাই যেন এক-টানা একটি গান, বিরাম নাই, ভঙ্গ নাই, যতি নাই। যেন সেই গানখানিকেই তুলিয়া ধরিয়া তিনি দেবতার পায়ে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

শুধু গান গাওয়া নয়, মীরা নিজেই গান রচনাও করিতেন। হৃদয়ের সমস্তখানি আবেগ ও অনুভূতিকে একান্তে উজাড় করিয়া দিয়া তিনি রচনা করিতেন সেই গীতাবলী, এবং তাঁহার প্রগাঢ় কণ্ঠে গীত হইয়া সেই গানের সুরের মূর্চ্ছনা কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাতাসের তরঙ্গে কোন্ ঊর্দ্ধে চলিয়া যাইত, কে জানে? মীরার এই সকল দোহা বা ভজনগানগুলির ভাষার নাম দিঙ্গল, রাজস্থানের তখনকার এক মিশ্র ভাষা। পদের লালিত্যে ও প্রসাদগুণে এবং ভাবের সম্পদে এই গানগুলি যুক্ত-প্রদেশের সূরদাস বা বাঙ্গালার গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতির পদাবলীর চেয়ে নিকৃষ্ট নয়। মীরার অনেক গানেরই ভণিতায় আছে, 'মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর'। তিনি স্পষ্টই বলিতেন, 'মেরে তো গিরধর গুপাল, দুস্‌রো ন কোই'—আমার

শুধু গিরিধারী গোপাল, আর কেউ নয়। এই গিরিধর গোপালকেই তিনি উদয়াস্ত অনুধ্যান করিতেন, তাঁহার নিকটেই তিনি একাগ্রভাবে আত্ম-নিবেদন করিয়াছিলেন। মীরা তাঁহাকে আরাধনা করিতেন নিজের স্বামী কল্পনা করিয়া। সাধ্বী স্ত্রী পতিকে যেমন সর্ব্বস্বজ্ঞানে ভালবাসেন, মীরাও তেমনই অনুরাগে তাঁহার দেবতাকে ভালবাসিয়া তাঁহার সহিত মিলন আকাঙ্ক্ষা করিতেন। তাঁহার গানের ধুয়াই ছিল, 'বিন্ প্রেমসে নহি মিলত নঁদলাল'।

দুঃখ এই, মীরার জীবনীর অনেক কথাই সঠিক জানা যায় না, আবার অনেক কথা অতিরঞ্জিত। আরও দুঃখ, খ্যাতির বিড়ম্বনায় অনেক অলীক কাহিনী তাঁহার জীবনীর মধ্যে গোপন পথে প্রবেশ লাভ করিয়া অনাসৃষ্টি কাণ্ড বাধাইয়াছে।

রাজপুতনায় যোধপুরের মাইল চল্লিশ উত্তর-পূর্ব্বে মেড়্তা নামক করদ-রাজ্যে ছিলেন দুদাজী নামে রাঠোর-বংশীয় এক সামন্ত কিংবা জায়গীরদার। মেড়্তার এই রাঠোর পরিবার মেবারের রাণা-বংশেরই একটি শাখা, এবং তাঁহাদেরই অধীনস্থ সামন্ত ছিলেন। দুদাজীর কনিষ্ঠ পুত্র রতনসিংহকে তিনি চৌখরি, কুড়্কী প্রভৃতি বারখানি গ্রাম দান করেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই রতনসিংহেরই একমাত্র সন্তান মীরাবাঈ জন্মগ্রহণ করেন, কেহ বলেন কুড়্কীতে, কেহ বলেন কুড়্কীর সংলগ্ন চৌখরিতে। অতি শৈশবেই মীরা মাতৃহীনা হন, ঐ সময় মীরাকে তাঁহার মাতামহী কিছুকাল লালন করেন। তারপর দুদাজী মেড়্তায় তাঁহার নিজের সন্নিধানে মাতৃহীনা পৌত্রীকে

আনয়ন করিয়া তাঁহাকে পালন করিতে থাকেন। পিতামহের স্নেহের ছায়ামণ্ডপে বসিয়া মীরার বাল্য অতিবাহিত হয়। দুদাজী পৌত্রীকে শুধু আদরই দেন নাই, লেখাপড়াও শিখাইয়াছিলেন, এবং এই শিক্ষাই ছিল উত্তর-জীবনে মীরার রচিত গীতিকার উৎকর্ষের মূলে। তাছাড়া, দুদাজীর বংশ ছিল বিষ্ণুভক্ত, দুদাজী নিজেও ছিলেন একজন পরম বৈষ্ণব, তিনিই মেড়্‌তার প্রসিদ্ধ চতুর্ভুজদেবের মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। পিতৃ-পিতামহের বংশের ধর্ম্মীয় এই ঐতিহ্য ও সংস্কারের আবেষ্টনে শিশু মীরার অন্তঃকরণে ভক্তির যে বীজ উপ্ত হয়, পরে তাহাই শাখা-প্রশাখা মেলিয়া প্রকাণ্ড তরুবরে পরিণতি লাভ করে।

মেড়্‌তায় দুদাজীর মন্দিরে তাঁহাদের গৃহদেবতা গোবিন্দজীর বা গিরিধরলালজীর মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। শিশু মীরাকে কেন্দ্র করিয়া এই মূর্ত্তি সম্বন্ধে একাধিক কাহিনী প্রচলিত। এক কাহিনী বলে, শৈশবে একদা এক বিবাহের শোভাযাত্রা দেখিয়া মীরা তাঁহার মাতাকে প্রশ্ন করেন, মা, আমার বর কোথায়? তাঁহার মাতা হাসিয়া গোবিন্দজীর মূর্ত্তি অঙ্গুলি-সঙ্কেতে দেখাইয়া বলেন, ঐ তোমার বর। এবং তখন হইতেই নাকি মীরার চিত্তে গোবিন্দজীকে প্রিয়তম জ্ঞানের অরুণোদয়। আর এক কাহিনী মীরাদের বাড়ীতে শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তি সহ এক অতিথি সাধুর আগমন, ও মূর্ত্তিটি দেখিয়া উহা পাওয়ার জন্য বালিকা মীরার ব্যাকুলতা দিয়া আরম্ভ। কিন্তু সাধু তাঁহার মূর্ত্তি দিতে যাইবেন কেন? বেগতিক দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি মূর্ত্তি-সহ অদৃশ্য হইয়া যান। তখন মীরার দুঃখ রাখিবার স্থান থাকে না, মূর্ত্তি ব্যতীত তাঁহার প্রাণ যায়

যায়। তিন দিন পর অকস্মাৎ সেই সাধু ফিরিয়া আসিয়া মূর্ত্তিটি মীরার হস্তে অর্পণ করিয়া জানান, উহা বালিকাকে প্রদান করিতে তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হইয়াছেন। তখন হইতেই মূর্ত্তির প্রতি মীরা অত্যন্ত অনুরক্তা হইয়া ইঁহার পূজায় অনুক্ষণ কাটাইতে থাকেন।

ক্রমশঃ মীরার বয়স বাড়িয়া চলে। ইতিমধ্যে তাঁহার পিতামহ দুদাজী পরলোকগমন করায় মীরার তত্ত্বাবধানের ভার পড়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত বীরমজীর উপরে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মীরার তনুরুচি আর কণ্ঠশ্রী পরস্পর অতিক্রমের স্পর্দ্ধিত প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়া দেয়। বাস্তবপক্ষে, তাঁহার দেহ-বল্লরীকে ঘিরিয়া যে রূপশিখা নৃত্যের ছন্দে জ্বলিতে থাকে, এবং কণ্ঠের সুরের আলাপ ভাবে ও ভঙ্গিতে, মীড়ে ও গমকে যে এক রসলোক সৃষ্টি করে, তাহারই সঞ্চারী খ্যাতি তাঁহাকে মেবারের পবিত্র রাণা-কুলের বধূত্বে বরণের হেতু হয়।

মীরার বিবাহ ও বিবাহোত্তর জীবন সম্বন্ধে মেবারের রাণা কুম্ভকে তাঁহার পতির আসনে বসাইয়া কুম্ভকে দিয়া তাঁহার উপর নানা উৎপীড়নের যে গল্প অল্পাধিক এক শতাব্দী ধরিয়া প্রচলিত আছে, তাহা নিতান্তই রূপকথা। মীরার স্বামী ছিলেন রাণা কুম্ভের পৌত্র সংগ্রামসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র ভোজরাজ। ভোজরাজের সহিত মীরার বিবাহ হয় ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে। শ্বশুরালয়ে যাওয়ার সময় মীরা মেড়্‌তা হইতে গিরিধরজীর বিগ্রহটিও চিতোরে লইয়া যান। ত্রিভঙ্গ, সুঠাম মূর্ত্তি, বামহাতে গোবর্দ্ধন আর ডানহাতে অধর সংলগ্ন মুরলী। মেড়্‌তায় সেই ফেলিয়া-আসা জীবনের মুক্তধারা চিতোরে ছিল না, হয়ত বা নূতন বধূরাণীর কিছুদিন রাজান্তঃপুরের

সোনার খাঁচা ভালও লাগে নাই, কিন্তু ভোজরাজের সহিত মীরার অপ্রীতিকর সম্বন্ধের কোনই প্রমাণ নাই, বরং তাঁহাদের দাম্পত্য-জীবন বিশেষ সুখেরই হয়। কিন্তু স্বামি-সুখ মীরা বেশীদিন ভোগ করিতে পারেন নাই। বিবাহের দশ বা তাহারও কম বৎসরের মধ্যেই তাঁহার স্বামীর যুবরাজ অবস্থায় মৃত্যু হয়, তখন মীরার বয়স তেইশ-চব্বিশ বৎসরের অনধিক। স্বামীর পরলোকগমনের তিন বৎসরের মধ্যে মীরা পিতৃহীনাও হন, এবং তাহার কিছুদিন পর তিনি শ্বশুরকেও হারান। পর পর এই সকল শোক মীরার অন্তরে রেখাপাত করে গভীর, প্রগাঢ়। বাল্যাবধি তাঁহার মধ্যে যে ধর্ম্মপ্রাণতা জাগরূক ছিল, মানব-জীবনের অনিত্যতা ও ক্ষণভঙ্গুরতা বার বার প্রত্যক্ষ করিয়া এখন তাহা হইয়া উঠে আরও সক্রিয়। ঐহিক সমস্ত ভোগ বিসর্জ্জন দিয়া চিতোরে তিনি সন্ন্যাসিনীর ন্যায় অতি সামান্যভাবে কালাতি-পাত করিতে থাকেন। গিরিধরজীর সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া দিনের অধিকাংশ সময়ই ঠাকুরের বিগ্রহের সম্মুখে ভাবাবেশে গান গাওয়া ও নৃত্য করা, এই হইল তাঁহার কর্ম্মকাণ্ডের মুখ্য অংশ। ঐ সময় গিরিধরজীর মন্দিরে বহু-সংখ্যক বৈষ্ণব সাধুর সমাগম হইত, তাহাদের সঙ্গে তিনি হরিগুণ গান করিতেন।

রাণা সংগ্রামসিংহের মৃত্যুর পর মীরার যে দুই দেবর পর পর চিতোরে রাণা হন, তাহার মধ্যে দ্বিতীয় দেবর বিক্রমজিৎই মীরার এইভাবে ধর্ম্মচর্চ্চার সমধিক বিরোধী ছিলেন। রাজান্তঃপুরের শুচিতাকে পদদলিত করিয়া মেবারের রাজকুলবধূ যে এইরূপে একটা মন্দিরে গিয়া দিবানিশি হরিভক্ত-সাধু নামে

কতকগুলি আগন্তুকের লোলুপ দৃষ্টির সম্মুখে নাচগানে মত্ত হইয়া থাকেন, ইহা রাণা বিক্রমজিতের অসহ্য বোধ হয়। তিনি প্রথমটা মীরাকে তর্কের দ্বারা বুঝাইতে চাহেন, কিন্তু মীরা কিছুই বোঝেন না। তখন তাঁহার উপর নানারূপ নির্য্যাতন আরম্ভ হয়, এবং হয়ত এই নির্য্যাতনে মীরার শ্বশ্রূ ও ননদেরও কিছু প্ররোচনা ছিল। কিন্তু মীরাকে তাঁহারা চিনিতেন না। যে তেজের অনল মীরার বুকে জ্বলে তাহা কি পদার্থ, এবং কত তাহার দাহিকা-শক্তি, তাহা তাঁহাদের জানা ছিল না। এই প্রদীপ্ত তেজেরই পাশাপাশি মীরার বুকের আর একদিক অধিকার করিয়া আছে বৈষ্ণবীয় বিনয় ও দৈন্যাত্মিকা বুদ্ধি। কিন্তু সনাতন প্রথার খাতিরে বা জনমতের ভয়ে নিজের আদর্শকে পথের ধূলায় ফেলিয়া দিবেন এইরূপ দৌর্ব্বল্যের স্থান তাঁহার হৃদয়ের কোথাও নাই। লোকলজ্জা, কুলমর্য্যাদা প্রভৃতির প্রতি তাঁহার বিদ্রোহী মনোভাব এবং জনমতের প্রতি উপেক্ষার বা অবজ্ঞার অপ্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত তাঁহার কতিপয় গানেই অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। মীরাকে যখন কোনও নির্য্যাতনেই দমন করা গেল না, তখন তাঁহাকে ইহজগৎ হইতে অপসারিত করিবার জন্য বিক্রমজিৎ তুইবার চেষ্টা করেন, একবার এক পাত্র বিষ ও দ্বিতীয়বার একটি পেটিকার মধ্যে একটি বিষধর সর্প তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া। বীজাবর্গী জাতীয় এক বৈশ্য মহাজনের হাত দিয়া তিনি বিষের পেয়ালা মীরাকে পাঠান, ঠাকুরের চরণামৃত বলিয়া। কিন্তু এইভাবে অপমৃত্যু মীরার ললাট-লিপি ছিল না বলিয়াই মীরা বাঁচিয়া রহিলেন। ভক্তমনের বিশ্বাস, সেই হলাহল মীরা অমৃতের ন্যায়

পান করেন, তাঁহার দেহের উপর সেই গরলের কোনও প্রতিক্রিয়াই হয় নাই, আর সাপটি একটি ফুলের মালা হইয়া পেটিকার মধ্যে বিরাজ করে। কিন্তু তাঁহার প্রাণনাশের এই অপচেষ্টার স্মৃতি মীরার মর্ম্মে তীব্র বেদনার সহিত বিঁধিয়া থাকে, এবং সেই জন্যই তিনি একাধিক দোহায় ইহার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, 'বিষরা প্যালা ভেজিয়া রে'।

চিতোরে তাঁহার উপর এই সকল অত্যাচার ও নিগ্রহের সংবাদ পাইয়া মীরার জ্যেষ্ঠতাত বীরমদেব তাঁহাকে মেড়্তায় লইয়া যান। যাওয়ার সময় মীরা গিরিধরের মূর্ত্তিটি লইতে ভোলেন নাই। কিন্তু এখানেও বেশীদিন অবস্থান মীরার অদৃষ্টে সয় না। শত্রুকর্তৃক বীরমজী মেড়্তার অধিকার ভ্রষ্ট হন। মেড়্তার আশ্রয়ও চ্যুত হইয়া মীরা সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া দিনপাত করিতে সঙ্কল্প করেন। প্রথমে যান তিনি মথুরা ও বৃন্দাবনে। কথিত আছে, বৃন্দাবনে ঐ সময় চৈতন্যদেবের প্রিয় শিষ্য রূপগোস্বামীর, অথবা রূপের ভ্রাতুষ্পুত্র জীবগোস্বামীর, সহিত মীরার সাক্ষাৎকার হয়। ঐ অঞ্চলে কিছুদিন থাকিয়া তিনি গুজরাটে কৃষ্ণের নগরী দ্বারকায় চলিয়া যান, জীবনের অবশিষ্টাংশ সেখানে রণছোড়জীর বা দ্বারকানাথের সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরে ভজন গাহিয়া কাটাইয়া দিবার বাসনায়।

মীরার তৃতীয় ও কনিষ্ঠ দেবর উদয়সিংহ মেবারের রাণা হইয়া মীরাকে চিতোরে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য কয়েকজন ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া দেন, কিন্তু মীরা কিছুতেই আর গৃহমুখী হইতে সম্মত হন না। মীরার জ্যেষ্ঠতাত বীরমদেব মেড়্তার গদী পুনরুদ্ধার করিয়া

ভ্রাতুষ্পুত্রীকে মেড়্তায় প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য বহু উপরোধ জানান, তিনিও ব্যর্থকাম হন। বীরমদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বৈষ্ণবপ্রবর রাও জয়মলজীরও সকল প্রচেষ্টা একই ভাবে নিষ্ফল হয়। ঐ দ্বারকায়ই ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি কোনও সময়ে, তখনও পঞ্চাশের নিম্নে বয়স তাঁহার, মীরা লোকনয়নের অন্তর্দ্ধান হইয়া যান, কেহ জানে না কেমন করিয়া। এ সংসারে রহিয়া যায় শুধু তাঁহার নামটি, যাহাকে বেড়িয়া এক উজ্জ্বল প্রভামণ্ডল আজও দীপ্তি পাইতেছে, আর তাঁহার রচিত দোহাগুলি, যাহা এখনও অগণন ভারতবাসীকে ভগবৎ প্রেমে অভিষিক্ত করিতেছে।

রাণী দুর্গাবতী

উড়িষ্যার পশ্চিমে, মধ্য-প্রদেশের উত্তরভাগে, গোণ্ডদিগের কয়েকটি রাজ্যের সমষ্টি লইয়া যে গোণ্ডয়ানা প্রদেশ, তাহারই একটি রাজ্যের, গড় কটঙ্গার, চল্‌তি কথায় গড়মণ্ডলের, রাণী দুর্গাবতী। কতটুকুই বা রাষ্ট্র এই গড়মণ্ডল, কে বা জানিত ইহার কথা? কিন্তু ইহার স্বাধীনতাকে অনাহত রাখিবার জন্য একদা দুর্গাবতী রণক্ষেত্রে বীরত্বের যে পরাকাষ্ঠা দেখান, সেই কারণে গড়মণ্ডলের নাম চার শতাব্দী ধরিয়া ধন্য হইয়া আছে।

সেদিন দুর্গাবতীর মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁহার শোকে কোনও দিন কেহ একবার দুঃখের কান্না কাঁদে নাই, এক ফোঁটা বেদনার অশ্রুপাত করে নাই। বলে, উহা ত একান্ত গৌরবের মৃত্যু। কেহ কেহ আরও ফেনাইয়া বলে, সেদিন দুর্গাবতীর দেহটারই পতন হইয়াছিল, কিন্তু দুর্গাবতী মরণকে জয় করিয়া বাঁচিয়া আছেন।

রণক্ষেত্রে গিয়া যুদ্ধ করার কথা নারীর ধর্ম্মশাস্ত্রে কোথাও লেখা নাই। যুদ্ধ নারীর ধর্ম্মও নয়, কর্ম্মও নয়। নারী অন্তঃপুর-বিহারিণী। অন্তঃপুরেই তাহার রাজ্য, সে সেখানকার মহিমান্বিতা মহারাণী। সেখানে সে কল্যাণী-মূর্ত্তিতে স্নেহে, মমতায়, করুণায়, ও সেবায় যেমন এক শীতল ছায়া-বিতান রচনা করে, তেমনই আবার ভগবতী সাজিয়া বাহির-বিশ্বে জীবন-যুদ্ধের, অথবা লোক-যুদ্ধের জন্য পুরুষকে নিত্য অজস্র শক্তিও যোগায়।

তবু দেশে দেশে অসংখ্য নারীকে তাঁহাদের নারী-ধর্ম্মের সঙ্কোচ সাধন করিয়া, হাতে যুদ্ধের প্রহরণ লইয়া রণ-চণ্ডিকার সংহার-মূর্ত্তিতে সংগ্রাম-ভূমিতে আবির্ভূতা হইতে হইয়াছে। সেখানে হয় তাঁহারা প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন, না হয় বন্দিনী হইয়াছেন, না হয় কেহ কেহ জয়ের মালা বুকে দোলাইয়া বাড়ী ফিরিয়াছেন। কিন্তু যে কোনও ক্ষেত্রেই হোক্, যত নারী যত রক্ত-সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছেন, সাধারণতঃ সেগুলি তাঁহাদের আক্রমণাত্মক সখের অভিযান নয়, অধিকাংশেরই পটভূমিকায় রহিয়াছে এক অতি বড় দুঃখের কাহিনী এবং প্রায়ই সেই দুঃখের উৎস হইতেছে দেশমাতৃকার স্বাধীনতার বিপন্নতা। যেন প্রায় সকল নারী এই একই নিয়মের পথ ধরিয়া যুগে যুগে যুদ্ধে চলিয়াছেন।

রাণী দুর্গাবতীও এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম নন। তিনি ছিলেন গড় কটঙ্গার বৈষ্ণব রাজা দলপতি রায়ের রাণী। দলপতি বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব। নৃসিংহপ্রকাশ নামে একখানি স্মৃতিশাস্ত্রের গ্রন্থ দলপতি-বিরচিত বলিয়া লেখা। কিন্তু সম্ভবতঃ তাঁহার গুরু সূর্য্য-পণ্ডিত গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়া রাজ-শিষ্যের নামে প্রচার করেন। এই গ্রন্থে দলপতি 'মহারাজাধিরাজ', 'সূর্য্যবংশতিলক', 'বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক' প্রভৃতি বড় বড় আখ্যায় বিভূষিত। তাঁহার রাণীদের মধ্যে দুর্গাবতীই মুখ্যা পত্নী। সাত বৎসর রাজত্বের পর দলপতির মৃত্যু হইলে দুর্গাবতী তাঁহার নাবালক পুত্র বীর-নারায়ণের অভিভাবিকা হইয়া রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। তাঁহার হাতে ছিল সুশাসনের সোনার কাঠি,

সেই কাঠির স্পর্শে তিনি দেখিতে দেখিতে গড়মণ্ডলকে ভরিয়া দেন ধন ও ধান্যে, সুখ ও স্বস্তিতে। বিনত মুখে তাঁহাকে শুনিতে হইত হৃষ্ট প্রজার কলকণ্ঠের জয়গান। সমাজ ও ধর্ম্ম জীবনের উন্নতি কামনা করিয়া ব্রত, আচার, ব্যবহার, দান, ঈশ্বরারাধনা প্রভৃতি বিষয় ভেদে তিনিও পদ্মনাভ নামে এক পণ্ডিতকে দিয়া একখানি ব্যাপক স্মৃতি গ্রন্থ লেখান। কৃতজ্ঞ পদ্মনাভের দেওয়া উহার নাম দুর্গাবতীপ্রকাশ। এই গ্রন্থের 'বদান্যসীমা', 'অমলগুণা' প্রভৃতি রাণীর বিশেষণগুলি অত্যুক্তি নয়। পদ্মনাভ পরে বীর-নারায়ণকে উদ্দেশ করিয়া বীর-চম্পু নামে গদ্য ও পদ্য মিশ্রিত একখানি চম্পু কাব্যও লেখেন। রাণী দুর্গাবতীর আনুকূল্যে রচিত আরও গ্রন্থ তাঁহার বিদ্যোৎসাহিতার ও সমাজ-হিতৈষণার সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

কিন্তু এই দিন আর বেশীকাল রহে না। গড়মণ্ডলের ছাদে ছাদে চিল-শকুন বসিতে থাকে, দিনের বেলায় পথে পথে শিয়াল ডাকে, পুরুষের বামবাহু স্পন্দিত হইতে থাকে, নারীর ডান চোখের পাতা শুধু শুধুই নাচে,—এমনই আরও সব অলক্ষণ, সময় নাই, অসময় নাই, প্রকাশ পায়। কিন্তু তখনও কেহ জানে না অমঙ্গল কোন্ পথে কি রূপ ধরিয়া আসিতেছে, এবং কখন।

জানিতে বেশী দেরীও হয় না। অবিলম্বেই হাট-বাট-ঘাটের ও নারী-মহলের সমস্ত জল্পনা-কল্পনার অবসান হইয়া যায়। জানা যায়,—সে এক নিদারুণ ভয়াবহ কথা,—বাদশাহ আকবরের কারা-প্রদেশের শাসনকর্ত্তা দুর্দ্ধর্ষ বীর আসফ খাঁর পরিচালনায় রক্ত-পাগল মোগল-বাহিনী প্রকৃতির এই লীলা-নিকেতন গড়মণ্ডলের

উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে। পশ্চিমে মালব-রাজ্য দুই বৎসর পূর্ব্বে মোগল-সাম্রাজ্যের কুক্ষিগত হইয়া গিয়াছে, এইবার ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে গড়মণ্ডলের পালা।

শুনিয়া সকলে প্রথমে স্তম্ভিত, পরে মহা শঙ্কিত হইয়া উঠে। আসন্ন অকল্যাণের পদধ্বনি বুঝি শোনা যায়। গড়মণ্ডল তবে শ্মশানে পরিণত হইতে আর কতক্ষণ ?

এই সন্ধিক্ষণে রাণী দুর্গাবতীর বজ্রকণ্ঠের বাণী শোনা যায়, মাভৈঃ। সবাই উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে থাকে রাণীর অভয় বাণী, ভয় কিসের ? যদি মরিতেই হয়, দেশের জন্য ভাল করিয়া এক সঙ্গে মরিব, কিন্তু বাঁচিয়া থাকিয়া দেখিব না যে দেশমাতা পরাধীনতার শৃঙ্খল ভারে কাঁদিতেছেন।

রাণীর আশ্বাসে ভয়ের মেঘ কাটিয়া যায়। গড়মণ্ডলের তখন সর্ব্বত্র সাজ-সাজ রব পড়িয়া যায়। যাহার শক্তি আছে, কিশোর হোক্, যুবক হোক্, প্রৌঢ় হোক্, সকলেই সাজে। এই যুদ্ধের কে অধিনায়ক হইবেন তাহা জানা নাই। না-ই বা জানা থাকুক, যে পারে সকলেই পোষাক পরিয়া, আয়ুধ লইয়া, যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইতে থাকে। মরণ ত একবারই হয়, দুইবার কেহ মরে না, তবে দেশের জন্য এই যুদ্ধে মরিতে ভয় কি ? পরাধীনতার নাগপাশের চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়।

যাত্রাকালে সকলে প্রচণ্ড বিস্ময়ে দেখে, সম্মুখে মদস্রাবী রণকুঞ্জরের উপর রহিয়াছেন স্বয়ং রাণী দুর্গাবতী, এক হাতে ধনুর্ব্বাণ, আর এক হাতে বিরাট এক শূল। মাথায় রবিকরোজ্জ্বল সোনার মুকুটের রক্তিম আভায়, আর যুদ্ধের উন্মাদনায়, তাঁহার

সারা মুখ রাঙ্গা। পার্শ্বে বীরসাজে পুত্র বীর-নারায়ণ,—যৌবনে পা দিয়াছে মাত্র, তবু তেজে যেন ফাটিয়া পড়ে। দুর্গাবতীর হাতী চলে। পিছনে চলে সেনাদল। তাহাদের রণ-হুঙ্কারে ও অস্ত্রের ঝনৎকারে দিগন্ত কাঁপে।

আসফ খাঁর ধারণা, বিনা যুদ্ধেই ক্ষুদ্র গড়মণ্ডল তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের খ্যাতির নিকট আত্মসমর্পণ না করিয়া পারে না। তিনি ভাবিয়াছিলেন, যুদ্ধের নামেই নারীর অন্তরাত্মা যায় শুকাইয়া, অজেয় মোগল-বাহিনীর অগ্রগতির কথা ও গর্জ্জমান কামানের শব্দ শুনিয়া রাণী দুর্গাবতী কতক্ষণ আর সন্ধি ভিক্ষা না করিয়া থাকিবেন? এই হেতু তাঁহার সৈন্যগণের তখন যুদ্ধের প্রস্তুতি তেমন ছিল না। সহসা গড়মণ্ডলের বাহিনীর এই অতর্কিত আক্রমণের বেগ তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয়। স্বাধীনতাকামীর হাতে আক্রমণকারীর শোচনীয় পরাজয়ের এক বিশিষ্ট ও স্মরণীয় পুনরাবৃত্তি।

এই পরাজয়ের গ্লানি আসফ খাঁ বেশী দিন বহিতে রাজী নন। যথাশীঘ্র আরও সৈন্যবল, আরও অস্ত্র-সম্ভার আনাইয়া নূতন শক্তিতে আক্রমণ করেন গড়মণ্ডলের বাহিনীকে। জব্বলপুরের অদূরে এক পক্ষে মুষ্টিমেয়, অপর পক্ষে বিপুল সেনার সমাবেশ, তবু যুদ্ধ হয় ঘোরতর। বিজয়লক্ষ্মী বিলক্ষণ চঞ্চলা। যুদ্ধের উত্তেজনায় রাণীর সৈন্যদের অনেকে যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যস্থ শীর্ণ নদী অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায় ওপারে। কিন্তু অকস্মাৎ প্লাবন আসিয়া নদীর একূল ওকূল ছাইয়া ফেলে। মোগলের কামান তখন মুখ দিয়া অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণ করে, আর রাণীর

সৈন্যগণ তীর-ধনুক হাতে করিয়া ধরাশায়ী হয়, ঐ উদ্বেল, উদ্দাম নদী পার হইয়া আসিয়া এপারের গিরিপথে পলাইয়া আশ্রয় লইবে তাহার উপায় নাই। আসলে, ইহাই যুদ্ধের ভাগ্য একরূপ নিরূপণ করিয়া দেয়। রাণীর অবশিষ্ট রণক্লান্ত সৈন্যদের পক্ষে জয়ের আশা করা তখন ভুল, সে ভুল তাহারা করেও নাই। কিন্তু রাণীর অদম্য বিক্রম ও সাহসে তখনও ভাটার লক্ষণ দেখা যায় না। তখনও তিনি তাহাদিগকে উৎসাহের নব নব বাণী শুনাইতে থাকেন। শুধু তাহাই নয়, হস্তিপৃষ্ঠ হইতে তাঁহার অব্যর্থ শরসন্ধানে এক এক করিয়া তিনি অনেকগুলি শত্রুকেও বিদ্ধ করিতে থাকেন। বীর-নারায়ণও সাক্ষীগোপাল সাজিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আসে নাই, সে-ও বীরদর্পে যুদ্ধ করিতেছে। এমন সময় শত্রুর এক তীর আসিয়া তাহাকে এমনই আহত করে যে, বৃন্তচ্যুত ফলের মতই বেগে সে হস্তিপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পতিত হয়। দুর্গাবতী দেখেন, তাঁহার স্বামীর বংশধরের, স্বাধীন গড়মণ্ডলের রাজার, রক্তাক্ত সুকুমার দেহখানি রণাঙ্গনের ধূলিতে লুণ্ঠিত হইয়া কি অসহ যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে! কিন্তু স্বাধীনতার একাগ্রদৃষ্টি পূজারিণীর আজ এসব তাকাইয়া দেখিলে চলিবে না। আগে নিজের দেশের স্বাধীনতা, পরে তাঁহার ছেলে। আজ এই যুদ্ধে সে-ও ত একজন সৈনিক মাত্র, এমন কত সৈনিক রণস্থলের এখানে ওখানে পড়িয়া এমনই গোঙাইতেছে; সে দিক হইতে দৃষ্টি ছিনাইয়া লইয়া হাতীর হাওদায় তখন একাকিনী রণরঙ্গিণী অগ্রসর হইতে থাকেন। সহস্রা বিপক্ষের

একটি তীর আসিয়া তাঁহার নয়নে বিদ্ধ হয়, তারপর আর একটি তাঁহার কণ্ঠে। ঝর ঝর রক্তের ধারায় স্নান করিতে করিতে দুর্গাবতী তখনও চাহেন যুদ্ধ করিতে, কিন্তু তাঁহার রক্তহীন কম্পিত হস্ত তাহা অস্বীকার করে, হাতের অস্ত্র হাত হইতে পড়িয়া যায়। কিন্তু তাঁহার প্রাণবায়ু বাহির হইবার পূর্ব্বেই যদি আসফ খাঁ তাঁহার দেহটাকে তুলিয়া উন্মত্ত উল্লাসে লইয়া যায় মোগল শিবিরে অথবা গড়মণ্ডলেরই প্রাসাদে,—দুর্গাবতী আর ভাবিতে পারেন না। কটিতটে ঝুলান খাপ হইতে ঝক্‌ঝকে অসিখানি মুক্ত করিয়া দেহের সবটুকু শক্তিতে বসাইয়া দেন নিজের বুকে। দুর্গাবতীর অন্তর্য্যামী সাক্ষী রহিলেন, প্রাণ থাকিতে দুর্গাবতী গড়মণ্ডলকে শত্রুর কবলিত হইতে দেন নাই।

বীরাঙ্গনা বলিয়া ভারতের যত নারীর গাথা শোনা যায়, দুর্গাবতীর নাম তাহার মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে। দুর্গাবতীকে স্মরণ করিয়া লোকে মুখে মুখে কত কথার মালা গাঁথিয়া যায়, ইতিহাস তাহার কিছুটা গ্রহণ করে, বাকীটা ফেলিয়া দেয়।

বিষ্ণুপ্রিয়া

বিষ্ণুপ্রিয়া যেন একটি স্রোতের ফুল,—যে স্রোতে উহা ভাসিয়া আসে, সেই স্রোতেই ভাসিয়া চলিয়া যায়, অথচ ফুলও স্রোতের কেহ নয়, স্রোতও ফুলের কিছু নয়। বিষ্ণুপ্রিয়াও তেমনই সংসারে আসিয়াছিলেন, কিন্তু দেখা গেল সংসারেরও তিনি কেহ নন, সংসারও তাঁহার কিছু নয়। সংসারও তাঁহার দিকে আসক্তিতে ফিরিয়া চাহে নাই, তিনিও সংসারকে আপন করিয়া লইবার আকর্ষণ খুঁজিয়া পান নাই। কিন্তু এজন্য তাঁহার ভাগ্যলিপি ছাড়া আর কাহাকেও দায়ী করা ভুল।

বিষ্ণুপ্রিয়া বাঙ্গালার মেয়ে, বাঙ্গালার বধূ, কাজেই বিষ্ণুপ্রিয়া-চরিত বাঙ্গালীর বড় আদরের। তাঁহার স্বামী নিমাইয়ের, বিশ্বম্ভরের বা গৌরাঙ্গের র্তি। দ্বতীয় পক্ষের পরিণীতা। প্রথমবার নিমাই বিবাহ করেন বল্লভ আচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীকে। ঐ বিবাহের কিছুদিন পর তিনি সশিষ্য পূর্ব্ববঙ্গ পরিভ্রমণে বাহির হন অর্থাগমের চেষ্টায়, লক্ষ্মী থাকেন তাঁহার বিধবা শ্বশ্রূ শচীর নিকটে নবদ্বীপে। ইহারই মধ্যে একদিন এক বিষধর সর্প দংশন করে লক্ষ্মীর পায়ে, লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠে চলিয়া যান। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে নিমাই ফিরিয়া আসিলে পর শচীমাতা পুত্রকে পুনরায় সংসারী করাইতে স্বভাবতঃই উদ্‌গ্রীব হন। পুত্রের মনোমত কনে পাওয়া যায় না, যায় না, অবশেষে একদিন গঙ্গার

ঘাটে স্নানে গয়া শচীদেবীর চোখে পড়ে সনাতন মিশ্রের এই রূপসী কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার ফুল্ল মুখখানি, যেন রূপের কলিটি আঁখি মেলিতেছে। ললাটভূমির অলকগুচ্ছ খেলিতে খেলিতে দুই মসৃণ কপোল-তটে নামিতেছে, তার সরমে জড়ানো দুইটি চোখ শান্ত আভায় হাসিতেছে। ঘরও ভাল, সনাতন মিশ্র নবদ্বীপের একজন বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, বৃত্তিতে রাজপণ্ডিত। শচীর কথায় কাশীনাথ পণ্ডিত নামক এক ব্যক্তি বিবাহের ঘটকালি করেন। নিমাই তখন পণ্ডিত বলিয়া নাম করিয়াছেন, অতএব বিবাহে কিছু ধূমধাম হইয়া থাকিলে তাহা বিচিত্র নয়। এবং ঐজন্য যাহা কিছু ব্যয় হয়, তাহার ভার গ্রহণ করেন নবদ্বীপের দুই ধনপতি। কথিত আছে, বিবাহের পর বর-কন্যা একত্র বাসরঘরে যাওয়ার মুখে বিষ্ণুপ্রিয়ার পদাঙ্গুষ্ঠে হোঁচট লাগিয়া কিঞ্চিৎ রক্তপাতও হয়।

সেই সময়ে বিষ্ণুপ্রিয়ার বয়স আর কত, এগার কি বার। আর নিমাইয়ের বয়স একুশ। শাশুড়ী থাকেন আদরিণী বউটি আর ঘরকন্না লইয়া, আর নিমাই থাকেন বিদ্যাবিলাসে মগ্ন হইয়া তাঁহার পুথিপাঁজি আর শিষ্যবৃন্দ লইয়া। বছর দুই এই লীলায় চলে। তরুণ অধ্যাপক-শিরোমণি তখন পিতৃকার্য্য সম্পন্ন করিতে যান গয়ায়। গয়া হইতে মাস কয়েক পর তিনি যে ফিরিয়া আসেন, যেন এক সম্পূর্ণ আলাদা মানুষটি। তাঁহার মনের রূপ আমূল বদ্‌লাইয়া গিয়াছে, অধুনা তিনি শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমাবেশে অত্যন্ত বিহ্বল। তাঁহার পূর্ব্বের সেই ঔদ্ধত্যের লেশমাত্র নাই, এখন তিনি আপনাকে অতি দীন বলিয়া

মানেন, আর কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করেন, কাঁদেন, হুঙ্কার করেন, কখনও বা ভূমিতে অচৈতন্য হইয়া পড়েন। ভোজনে রুচি নাই, শয়নে বিতৃষ্ণা, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নিশি জাগিয়া পোহান, অথবা শিষ্যগণ-সহ নর্ত্তন ও কীর্ত্তন করেন। ক্রমশঃ নবদ্বীপে তাঁহার নিত্য নূতন ভক্তসমূহ জুটিতে থাকেন, এবং বৎসরাবধি নবদ্বীপে এইভাবে প্রেমভক্তি বিলাইয়া চব্বিশ বৎসর বয়সে, ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে, তিনি গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। নিমাই শ্রীচৈতন্য হন। তারপর চৈতন্যদেব আর চব্বিশ বৎসর বাঁচিয়া থাকেন, তাহার মধ্যে ছয় বৎসর নানাস্থানে ও নানাতীর্থে গমনাগমনে কাটে, আর বাকী আঠার বৎসর তিনি নীলাচলে থাকিয়া রাধা-কৃষ্ণ-তত্ত্বের এক অভিনব রূপায়ণে যে ধর্ম্মমত স্থাপন করেন, সেই ধর্ম্ম নিজে আচরণ করিয়া অপরকে শিখান ও তাহাদিগকে এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব অতীন্দ্রিয় লোকের সন্ধান দেন।

কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হইল? বাসরঘরের সেই আহত পদাঙ্গুলির রক্তপাতের ফল সবটুকুই ফলিয়া যায়! বছর দুই স্বামীর সহিত দিনে ও দিনান্তে তাঁহার যেটুকু বা সম্পর্ক ছিল, গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর ঐ প্রেমোন্মত্তের সহিত সে সম্পর্কটুকু যে সীমারেখায় আসিয়া পৌঁছায় তাহাকে ঘুচিয়া যাওয়াও বলা যাইতে পারে। ইহারই মধ্যে এক আধ দিন শাশুড়ীর সঙ্গে গিয়া কোনও কোনও ভক্তের গৃহে স্বামীর নৃত্য ও কৃষ্ণলীলা-অভিনয় দেখিয়া আনন্দ ও কৌতুক উভয়ই লাভ করিয়া আসেন, বালিকা-চিত্ত কিনা।

তারপর তিনি কানে শোনেন, স্বামী সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। শোনায় কোনও ভুল নাই। মানেও অস্পষ্ট নয়। চৌদ্দ-পনের বৎসরের কিশোরী হইলেও, তাঁহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে। স্বামীর গলা জড়াইয়া অবোধ বালিকা কত মিনতি করেন, পায়ে ধরিয়া কত কান্না কাঁদেন, মায়াবনের ভীতা হরিণীর চোখ দিয়া কত কাতর অনুনয় জানান, কিন্তু পাষাণ কিছুতেই গলে না। বিষ্ণুপ্রিয়াকে দুইটি মিষ্ট কথায়, দুইটি সোহাগের বাণীতে ঘুম পাড়াইয়া, পা টিপিয়া টিপিয়া শয্যা হইতে ঘরের বাহিরে আসিয়া নিশীথের অন্ধকারে গা ঢাকিয়া সঙ্গোপনে তিনি চলিয়া যান। প্রভাত-সমীরে পরাজিতা জাগিয়া দেখেন শূন্য শয্যা, শূন্য গৃহ, শূন্য ত্রিভুবন।

মনে পড়ে, দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে কপিলবাস্তু নগরীতে আর একজন এমনি করিয়াই নিষুতি রাতে নিজের জীবন-সঙ্গিনীকে ফেলিয়া পলাইয়াছিলেন সত্যের সন্ধানে। কিন্তু সেদিন যশোধরার বয়স কত, আর এই দিন বিষ্ণুপ্রিয়ার কত বয়স ? সংসারে যশোধরার তবু এক বন্ধন ছিল নিজের ছেলেটি, কিন্তু বন্ধনহীনা বিষ্ণুপ্রিয়ার নিভৃত অন্তর্লোকের হাহাকার কে বুঝিল ? অভিনিষ্ক্রমণের পূর্ব্বে স্বামীর ছায়ায় ছায়ায় যশোধরা তবু তের বৎসর কাটাইয়াছিলেন, কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার ভাগ্যে তাহাই বা কয়টা দিন ? যশোধরা তাঁহার জীবনের শেষার্দ্ধের অনেকখানিই শ্রাবস্তীতে থাকিয়া স্বামীকে নয়ন ভরিয়া দেখার সুযোগ পাইতেন, এই দিক দিয়াও যশোধরার সহিত বিষ্ণুপ্রিয়ার তুলনা চলে না, বাঙ্গালার বিষ্ণুপ্রিয়া অনেক বেশী হতভাগিনী। ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তনের

পর গৌতম-বুদ্ধ যেমন কপিলবাস্তু দর্শনে আসিয়াছিলেন, সন্ন্যাসের পাঁচ বৎসর পর শ্রীচৈতন্যদেবও একবার বাঙ্গালায় পদার্পণ করিয়া, রীতি মানিয়া, নদীয়ায় পিতৃগৃহ দর্শন করিতে আসেন। কেহ কেহ বলেন, ঐ সময়ে গৃহদ্বারে বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর পদমূলে লুটাইয়া পড়েন, এবং চৈতন্য তাঁহার নিজের কাষ্ঠপাদুকা দান করিয়া উহার দ্বারাই তাঁহার বিরহ শান্তির আদেশ দেন, কোনও কোনও চৈতন্য-চরিতকার আবার সেকথাও বলেন না। মনে করি কথাটা অসত্য নয়, তবু চব্বিশ বৎসরের মধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়া ত দ্বিতীয়বার স্বামীকে চোখের দেখা দেখেন নাই। স্বামীর ভিটাখানি ছাড়িয়া এক পা-ও তিনি কখনও কোথাও নড়েন নাই। নবদ্বীপের ভগ্ন-নীড় হইতেই তিনি কলরব-মুখর নীলাচলের উদ্দেশে নীরবে অন্তরের প্রণাম জানান।

বিষ্ণুপ্রিয়ার আরও দুর্ভাগ্য, স্বামীর লীলাবসানের পরও দীর্ঘকাল, প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর, ধরিয়া তাঁহাকে তাঁহার দেহের বোঝা বহিতে হয়। যশোধরা এদিক দিয়াও ভাগ্যবতী, বৈধব্য-রাক্ষসী তাঁহার জীবনের একটি দিনও গ্রাস করিতে পারে নাই। পরবর্ত্তী চরিতাখ্যানের কথা,—শচীদেবীর দেহত্যাগের পর বংশীবদন নামে এক বিশ্বস্ত ব্যক্তি দেবী বিষ্ণুপ্রিয়াকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন। ঈশান নামে তাঁহার এক বৃদ্ধ ভৃত্য, এবং এক বা একাধিক পরিচারিকাও তাঁহার নিকটে থাকে। ভক্তগোষ্ঠীর কেহ কেহ কখনও কখনও কুশলাদি প্রশ্ন করিয়া যান। বিধবা হওয়ার পর সেই সুচরিতা এক একটি তণ্ডুলে এক একবার ষোলটি হরিনাম জপ করিয়া যতগুলি তণ্ডুল হয় তাহাই স্বহস্তে রন্ধন

করিয়া স্বর্গত স্বামীর উদ্দেশে নিবেদন করেন, এবং তাহারই একাংশ নিজে প্রসাদরূপে গ্রহণ করেন। এইভাবে তাঁহার মন্থর দিনগুলি একটি একটি করিয়া তাঁহার জীবন হইতে ঝরিয়া পড়িতে থাকে। তাঁহার দেহের সোনার বর্ণ অতি মলিন হইতে আরম্ভ করে, এবং কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশীর চন্দ্রের মত তাঁহার শরীরও ক্ষীণ হইতে থাকে।*

তারপর শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর ও দুঃখী শ্যামানন্দ এই বৈষ্ণব-ত্রয়ীর বৃন্দাবন হইতে বাঙ্গালায় প্রত্যাবর্ত্তনের ঐতিহাসিক ঘটনার কিছু আগে বিষ্ণুপ্রিয়া নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। কখন, কিভাবে, কেউ জানে না, কেউ লেখে না। গণনায় তাঁহার বয়স তখন আশীকে পিছনে ফেলিয়া আরও পাঁচ ছয় বৎসর চলিয়া যায়, কিন্তু এ গণনায় ভুল থাকিতে পারে।

শ্রীচৈতন্যের প্রকটকালেই কোনও কোনও ভক্ত পুরুষোত্তম জ্ঞানে তাঁহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিতে আরম্ভ করেন। শুনি, বিষ্ণুপ্রিয়াই নাকি এ বিষয়ে অগ্রদূত। গৌরীদাস পণ্ডিত, নরহরি সরকার ঠাকুর, কাশীশ্বর পণ্ডিত, গদাধর দাস প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্ত-প্রবরগণও বিভিন্ন স্থানে চৈতন্য-বিগ্রহ

---

* কনক জিনিয়া অঙ্গ সে অতি মলিন।
কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর শরীর প্রায় ক্ষীণ॥
হরিনাম-সংখ্যা-পূর্ণ তণ্ডুলে করয়।
সে তণ্ডুল পাক করি প্রভুকে অর্পয়॥
তাহারই কিঞ্চিন্মাত্র করয়ে ভক্ষণ।
কেহ না জানয়ে কেনে রাখয়ে জীবন॥

স্থাপন করেন, কিন্তু সে সব বিগ্রহ বিষ্ণুপ্রিয়া-মূর্ত্তি নিরপেক্ষ। বিষ্ণুপ্রিয়ার তিরোভাবের তিন-চারি বৎসর বা আরও পরে, আনুমানিক ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে, রাজসাহী জেলার খেতুরীতে অনুষ্ঠিত বৈষ্ণব মহোৎসবের সময় নরোত্তম দাস যে সকল মূর্ত্তি সেখানে স্থাপন করেন, তাহার মধ্যে চৈতন্য-মূর্ত্তির পার্শ্বে, বো! করি সর্ব্বপ্রথম, বিষ্ণুপ্রিয়ার মূর্ত্তিও স্থান লাভ করে। উহারই অল্পকাল পরে শ্রীনিবাস আচার্য্যও মহাসমারোহে অন্য মূর্ত্তির সহিত শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ বিগ্রহও অভিষেক করিয়া স্থাপন করেন। তাহা হইলে, মৃত্যুর পূর্ব্বে লোকায়ত দৃষ্টিতে যিনি মানবী ছাড়া আর কিছু ছিলেন না, মৃত্যুর পর তিনি দেবী.হন। সেই রিক্তা ও বঞ্চিতার আত্মার এইটুকুই সান্ত্বনা। স্রোতের ফুল স্রোতে ভাসিয়া গেলে পর তাহার পরিমলকে গানে গানে স্তুতি করিলে ফুলের যে সান্ত্বনা, এও সেই সান্ত্বনা।

তারাবাঈ

মহারাষ্ট্র-সূর্য্য শিব ছত্রপতির তেজস্বতী পুত্রবধূ তারাবাঈর জীবনী বৈচিত্র্যে ভরা।

শিবাজীর পরলোকগমনের পর মারাঠা-রাজ্যের সিংহাসন অধিকার করেন তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শম্ভাজী। তিনি কাপুরুষ ছিলেন না, বরঞ্চ কখনও কখনও তিনি বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ও ছিল উদার, তিনি শিক্ষিতও ছিলেন, কিন্তু ছিল না তাঁহার চরিত্রের মেরুদণ্ড। তাঁহার নয় বৎসরের কু-শাসনে বিশৃঙ্খলায় দেশ ভরিয়া উঠে, রাজকোষ শূন্য হয়, ও রাষ্ট্রীয় শক্তি দিনে দিনে ক্ষয় হইতে থাকে। সম্রাট ঔরংজীব স্বয়ং তখন দাক্ষিণাত্যে, তাঁহার বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা অধিকার-পর্ব্ব শেষ হইয়া গিয়াছে, এইবার তিনি মারাঠা-রাজ্য ধ্বংস ও গ্রাস করিতে কৃতসঙ্কল্প। মহারাষ্ট্রের কতগুলি গিরিদুর্গ সম্রাট-বাহিনী অধিকার করিয়াও লইয়াছে, এমন সময়ে একদিন শম্ভাজী সম্রাটের এক সেনা-নায়কের হাতে বন্দী হন, এবং ঔরংজীবের আদেশে অতি নিষ্ঠুরভাবে তাঁহাকে হত্যা করা হয়। তখন তাঁহার বয়স মাত্র বত্রিশ বৎসর।

শম্ভাজীর জীবনের এই শোচনীয় ও মর্ম্মান্তিক পরিণতির পরে মোগলের সহিত মারাঠাদের সন্ধির কোনও কথাই উঠিতে পারে না, উঠেও না। তাঁহার পত্নী ও রাজ্য-প্রধানদের এক মিলিত সভায় স্থির হয়, ইহার পর শম্ভাজীর শিশুপুত্র মারাঠা-

রাজ্যের রাজা বলিয়া বিবেচিত হইবেন, কিন্তু আপাততঃ তাঁহার অভিষেক হইবে না, এবং শম্ভাজীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাজারাম রাজ-প্রতিনিধি হিসাবে শাসনকার্য্য ও যুদ্ধ-বিগ্রহ চালাইবেন। রাজারাম এতদিন রায়গড়ে শম্ভাজীর বন্দী ছিলেন, মুক্তিলাভের পর রাজানুগত্যের শপথ করিয়া প্রতাপগড়ে গিয়া কুলদেবতা ভবানীর বরাভয় প্রার্থনা করেন, তারপর নব উৎসাহে কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়েন। শম্ভাজীর মৃত্যুতে ঔরংজীব আশ্বস্ত হন এই ভাবিয়া যে, তাঁহার দাক্ষিণাত্য বিজয় একরূপ সম্পন্নই হইয়া গিয়াছে; তথাপি তিনি দিল্লী ফিরিয়া যাইতে পারেন না, রাজধানী রায়গড়ের পতন না হওয়া পর্য্যন্ত। সুতরাং রায়গড়ের বিরুদ্ধে তিনি এক অভিযান পাঠান। কিন্তু ইতিমধ্যে সহজ ব্যাপারটা হইয়া উঠে জটিল। একজন মারাঠা সেনা-নায়ক হাজার দুই সৈন্য লইয়া গোধূলি-বেলায় যাত্রা করিয়া পর্ব্বত-মালার আড়ালে আড়ালে গা ঢাকিয়া গভীর নিশীথে তুলাপুর নামক স্থানে সম্রাটের শিবির অতর্কিতে আক্রমণ করেন। ঔরংজীবের সৌভাগ্য, তিনি অন্যত্র নিদ্রিত ছিলেন, তাই বাঁচিয়া যান। এই নৈশ অভিযানের আসল যাহা উদ্দেশ্য তাহা ব্যর্থ হইয়া যায় বটে, কিন্তু ইহা সমগ্র মারাঠা জাতির মধ্যে নিবিড় উৎসাহ ও আস্থার সঞ্চার করে। ওদিকে রায়গড়ের পতন হইতে বিলম্ব হয় না, এবং শম্ভাজীর পত্নী ও নয় বৎসর বয়স্ক পুত্র সাহু ধৃত হইয়া সম্রাটের শিবিরে প্রেরিত হন। রাজারাম তখন পান্‌হালা দুর্গে ছিলেন। পান্‌হালাও যখন আক্রান্ত হয়, রাজারাম বিশালগড়ে পলাইয়া যান, এবং সেই স্থানও নিরাপদ

নয় বুঝিয়া মহারাষ্ট্র ত্যাগ করিয়া দক্ষিণ-ভারতের পূর্ব্ব-উপকূলে পণ্ডিচেরীর কিছু পশ্চিমে জিঞ্জিতে গিয়া সেখানে মারাঠা-রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন। ঔরংজীব আশা করিয়াছিলেন, সাহু তাঁহার শিবিরে বন্দী হওয়ায় মারাঠা-শক্তি খণ্ডিত হইয়া পড়িবে। কিন্তু যাহা ঘটে তাহা উহা নয়।

মহারাষ্ট্রীয়গণ শিবাজীর আদর্শকে সম্মুখে ধরিয়া স্বদেশের জন্য জীবন পণ করিয়া অতুলনীয় পরাক্রমে যুদ্ধ করিতে থাকে। রামচন্দ্র বাব্‌ড়েকর, সান্তাজী ঘোরপড়ে, ধনাজী যাদব প্রভৃতি রণ-বিশারদগণের নেতৃত্বে কখনও সম্মুখ সমরে, কখনও গিরিদুর্গ-গুলির পশ্চাদ্ভাগে থাকিয়া, মোগল-বাহিনীকে যত্র তত্র বিব্রত ও বিপন্ন করিয়া তোলে, আর মোগলের অধিকৃত কতগুলি গিরিদুর্গ পুনরায় অধিকার করিয়া লয়। পক্ষান্তরে, কিছুদিন পরে দীর্ঘ অবরোধ ও দীর্ঘ প্রতিরোধের পর জিঞ্জি দুর্গের পতন হয়, এবং একজন ব্যাধ সাজিয়া রাজারাম কোনও রূপে সেখান হইতে পলাইয়া আসিয়া অবশেষে মহারাষ্ট্রে পৌঁছান। জিঞ্জির পতনে রাজারামের ক্ষতি হয় বিস্তর, রাজকোষে সঞ্চিত বহু ধন, বহু রত্ন হস্তচ্যুত হয়, কিন্তু পরাজয়ের গ্লানি মারাঠা-জাতিকে একটুও অভিভূত করে নাই। বারিতরঙ্গের উপর আঘাতের দাগের মত মারাঠাদের পরাজয়ের দাগ সাময়িক মাত্র, মিলাইতে দেরী হয় না। কোথা হইতে নিত্য নূতন শক্তি ও উন্মাদনা আহরণ করিয়া তাহারা আবার অস্ত্রধারণ করে, সে এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য। কিন্তু এটুকু বোঝা যায়, এরূপ শত্রুর সহিত যুদ্ধ করা বিড়ম্বনা মাত্র। এবং এই কথাটাই সবচেয়ে ভাল বুঝিতে পারেন সেদিন সম্রাট

ঔরংজীব নিজে। অথচ মারাঠার সহিত সন্ধি করিয়া দাক্ষিণাত্য-যুদ্ধের পূর্ণচ্ছেদ ঘটাইয়া তিনি যে দিল্লী ফিরিয়া আসিবেন তাহারও উপায় নাই।

১৭০০ খৃষ্টাব্দে বেরার অভিযানের সময় এক যুদ্ধক্ষেত্রে রাজারাম অসুস্থ হইয়া পড়েন, এবং তাহাই পরিশেষে তাঁহার মৃত্যু ডাকিয়া আনে। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার এক বালক পুত্রকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করা হয়, কিন্তু তিন সপ্তাহ রাজত্বের পর তিনি বসন্তরোগে প্রাণত্যাগ করেন। এই সময়েই মহারাষ্ট্রের রাজনীতি-ক্ষেত্রে রাজারামের প্রধানা পত্নী তারাবাঈর আবির্ভাব হয়।

রায়গড়ের দুর্গে রাজারাম যখন বন্দী ছিলেন, তখন তারাবাঈ ও তাঁহার সপত্নী রাজসবাঈও সেই দুর্গমধ্যেই ছিলেন। বন্দিদশা মোচনের পর রাজারাম যখন রায়গড় হইতে প্রতাপগড়ে ভবানী-মন্দিরে যান, তখনও ইঁহারা দুইজনে তাঁহার সঙ্গের সাথী ছিলেন। জিঞ্জিতে রাজারামের পলায়নের পর তাঁহারাও কিছুকাল মধ্যেই জিঞ্জিতে যান, এবং ঐ দুর্গের পতনের পর তাঁহারা আবার কোনওরূপে পশ্চিম-উপকূলে আসিয়া রাজারামের সহিত মিলিত হন।

একথা স্বীকার করিতেই হইবে, অদ্ভুত নারী এই তারাবাঈ। ক্ষমতায় অদ্ভুত, তেজে অদ্ভুত, বুদ্ধিতে অদ্ভুত। স্বামী বাঁচিয়া থাকিতেই প্রখর বুদ্ধিমত্তার ও পুরুষোচিত তেজের তিনি রাশি রাশি পরিচয় দেন, এবং সেই যোগ্যতায় শাসন-রজ্জুর অনেকখানি নিজের হাতে ধরিয়া রাখেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি চান

নিজের নাবালক পুত্রকে সম্মুখে রাখিয়া সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে লইবেন। কিন্তু তাঁহাকে প্রথম বাধা দেন তাঁহার সপত্নী রাজসবাঈ। রাজসবাঈয়েরও মনে তাঁহার পুত্রের ও নিজের জন্য অনুরূপ বাসনা অনুরূপ পরিমাণে ছিল। কিন্তু ক্ষমতায় ও সামর্থ্যে রাজসবাঈ তারাবাঈর নাগাল পান না। তারাবাঈ অচিরে তাঁহার নয় বৎসরের শিশুপুত্র শিবাজীর পক্ষে শাসন-পরিষদের এক সভা আহ্বান করিয়া তাঁহাকে মহারাষ্ট্রের রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবটি অনুরোধের, স্বর অনুজ্ঞার। দুই একজন এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন, কিন্তু তারাবাঈর তেজস্বিতার খরস্রোতে এই প্রতিবাদ কোথায় ভাসিয়া যায়। পুত্রকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিবার জন্য তাঁহার জিদ কঠিনতর মূর্ত্তি ধারণ করে। তিনি সকলকে উপলব্ধি করাইতে চান, এই সেই শিবাজী যাহার সম্বন্ধে শোনা যায় পাঞ্জাব হইতে রামেশ্বর-সেতুবন্ধ বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী। এই ভবিষ্যদ্বাণী নাকি একদা দেবী ভবানী করিয়াছিলেন ছত্রপতি শিবাজীর নিকট, তাঁহার নামধেয় কোনও বংশধরকে উদ্দেশ করিয়া। মারাঠা জাতি একথা জানিত, এবং এই পুরুষের আগমন প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব ছিল। ইতিমধ্যে তারাবাঈ মন্ত্রিমণ্ডলীর মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও অপসারিত করিয়া সেই স্থলে নিজের আস্থার জনকে বসাইয়া দেন। ফলে বাকী সকলে তাঁহাকে আর বাধা দিতে ভরসা পান না। ১৭০১ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে পান্‌হালায় সমারোহে তারাবাঈর পুত্র শিবাজীর অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া যায়। তারপর

তারাবাঈর প্রথম কাজ হয়, রাজসবাঈ ও তাঁহার পুত্রকে কারারুদ্ধ করা।

কিন্তু তবু তাঁহার মনের ভয় যায় না, সমস্যাকীর্ণ জীবনের সূচনায় বিভক্ত মারাঠা-শক্তির উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না। এই জন্যই তিনি কয়েকটি সর্ত্তে ঔরংজীবের নিকট বশ্যতামূলক সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠান। কিন্তু সম্রাট মারাঠাদের সমস্তগুলি দুর্গ দাবী করায় প্রস্তাবটি আর অগ্রসর হয় না।

সম্রাটের বিজয় অভিযান চলিতে থাকে। শম্ভাজীর মৃত্যুর আগে ও পরে মহারাষ্ট্রের যে দুর্দ্দিন ঘোর মনে হইয়াছিল, রাজারামের মৃত্যুর আগে ও পরে দুর্গত জাতির উপর সেই দুর্দ্দিন আরও ঘনঘটায়, আরও সঙ্কটের ধূলি উড়াইয়া, নামিয়া আসে। বলিতে গেলে, ১৭০৪ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি, প্রধান প্রধান গিরিদুর্গগুলির আর একটিও বাকী নাই, সবই চলিয়া গিয়াছে মোগলের হাতে। বিশালগড় গিয়াছে, পান্‌হালা আবার গিয়াছে, সিংহগড় ও তোরণাও চলিয়া গেল, আর কি-বা বাকী থাকে? এমন দিনে ঔরংজীব যদি তাঁহার মহারাষ্ট্র-অভিযান ব্যাপারে মনে মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না।

কিন্তু এদিকে তারাবাঈও পরিপাটিরূপে নিজের ঘর গুছাইয়া লইয়াছেন। মহারাষ্ট্রের রাজার তিনি অভিভাবিকা; এবং লোকের ও লোকচিত্তের তিনি একাধিনায়িকা। প্রায় সমস্ত কিছুর বিধি-ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণ-ভার তাঁহার হাতে। সেনাপতি ও

অন্যান্য রাজপুরুষ নিয়োগ ও পরিবর্ত্তন তাঁহারই ইচ্ছা ও অনিচ্ছা, অনুরাগ ও বিরাগ সাপেক্ষ। তিনিই এখন মহারাষ্ট্রের যেন সর্ব্বময়ী কর্ত্রী, অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতার নির্ঝরিণী। তখন তাঁহার বয়স ত্রিশের কাছাকাছি।

ক্ষমতা যদি চাহিয়াছিলেন, ক্ষমতা পাইয়া সে চাওয়ার যৌক্তিকতাকে তিনি সর্ব্বতোভাবে প্রতিপন্ন করেন। তিনি শুধু শিবাজীর পুত্রবধূই নন, কন্যাও হম্বীররাও মোহিতের, সেদিনের বহু যুদ্ধের প্রথিতযশা বীর। ক্রমশঃ দেখা যায়, তারাবাঈ সামরিক প্রতিভায়ও অদ্ভুত। দেখা যায়, উদয়াস্ত এক শিবির হইতে অন্য শিবিরে, দুর্গ হইতে দুর্গান্তরে, তিনি বিরামহীন ছুটাছুটি করিতেছেন, মহারাষ্ট্র-ভূমির যোদ্ধৃদের মনে উদ্দীপনা সঞ্চারিত করিতে। যৌবনরক্তে ক্লান্তি নাই। দেহধাতুতে অবসাদ নাই। সাধারণ সৈনিকের সামান্য জীবন যাপন করিয়া, রৌদ্রে দগ্ধ হইয়া, ভূমিতলে শয়ন করিয়া দিন হইতে রাত্রি কাটে তাঁহার নিজের ব্রত উদ্‌যাপনে। কর্ম্মাধ্যক্ষ ও সেনা-নায়কদেরও তিনি উৎসাহের বাণী শুনাইতে পরাঙ্মুখ বা পশ্চাৎপদ হন না, এমন কি অভিযান পরিকল্পনায় ও বিজয়োত্তর সংগঠনেও তাঁহাদিগকে মন্ত্রণা দিতে ছাড়েন না।

সময় ও সুযোগ বুঝিয়া মোগলের উপর মারাঠার পাল্টা আক্রমণ আরম্ভ হয়, এবং দেখিতে দেখিতে তাহা মোগল সাম্রাজ্যের অন্তস্তলকে কাঁপাইয়া তোলে। আক্রান্ত স্থানগুলি বাধা দিবে সে শক্তি নাই, কারণ সম্রাট তাঁহার বিজয়কে স্থির ও চির কল্পনা করিয়া নিজের বাদ্‌সাহি ফৌজকে সমৃদ্ধ করিবার

অভিলাষে এই সকল স্থান হইতে অধিকাংশ সৈন্যই অপসারিত করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, অবশিষ্ট মুষ্টিমেয় সৈন্যগণের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য বিদ্রোহের আশঙ্কায় ভূস্বামিগণের অস্ত্রশস্ত্র তিনি কাড়িয়া লইয়াছেন। মারাঠাগণকে কাজেই কোনও সংহত প্রতিরোধের সম্মুখীন হইতে হয় না। তাহারা তখন কেবলমাত্র আক্রমণ-নীতি পরিহার করে। যে সকল স্থানের অভ্যন্তরে তাহারা প্রবেশ লাভ করে, সেখানে সেখানে রাজস্ব সংগ্রহের সুবন্দোবস্ত করিয়া পাকাপাকি শাসন-বিধিও প্রবর্ত্তন করিতে থাকে। তারপর ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে দুই বিপুল মারাঠা-বাহিনী দুই সেনানীর অধীনে চলে যুগপৎ নর্ম্মদা অতিক্রম করিয়া। এক বাহিনী মধ্য-প্রদেশের ভূপালের মাইল পঞ্চাশেক উত্তর পর্য্যন্ত গিয়া লুঠতরাজে মালব-ভূমির অনেকখানি ছারখার করিয়া দিয়া আসে; অপর বাহিনী গুজরাটে ঢুকিয়া সম্রাটের এক বিশাল সেনাদলকে পরাভূত করিয়া গুজরাট হইতে আহম্মদাবাদ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ হইতে লুণ্ঠন-লব্ধ ধনের পাহাড় লইয়া ফিরিয়া আসে।

এই ধারাবহ বিপর্য্যয়ের ধাক্কায় সম্রাটের সেনাবাহিনীর মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়ে। তখন তাহাদের মধ্যে দেখা দেয় শ্লথতা, বিশৃঙ্খলা ও নৈরাশ্যের ম্রিয়মাণ কুজ্ঝটিকা। মারাঠাপক্ষে দেখা যায় সাফল্য-পরম্পরায় জাত সান্দ্র আত্ম-প্রত্যয়। মারাঠাগণকে বাধা দেওয়ার শক্তি যতই হারান, বৃদ্ধ সম্রাটের মনে মারাঠা নামে ততই ঘৃণার উদ্রেক হইতে থাকে। প্রতি শুক্রবার মুসলমানেরা তাঁহার দীর্ঘায়ু কামনা করিয়া যে প্রার্থনা করিত, বিজয়োদ্ধত মারাঠা নায়কগণ তাহারই বিদ্রূপাত্মক অনুকরণে নিজেদের

সৈন্যদিগকে আদেশ দেন তাহারাও যেন প্রতি শুক্রবার সম্রাটের অনন্ত পরমায়ু ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে, যেন এই ঘৃণার জ্বালায় তাঁহার মন অনন্তকাল পুড়িতে থাকে। নিরুপায় ঔরংজীব তখন মহারাষ্ট্র-বহির্ভূত দক্ষিণ-ভারতের অন্য তুই এক স্থান জয়ে মনোনিবেশ করেন।

এই পরিপূর্ণ সুযোগের সবটুকুই চতুরা তারাবাঈ তুই হাতে গ্রহণ করেন। একে একে আবার সকল মারাঠা তুর্গ অধিকার বদ্‌লাইয়া মারাঠার নিকটে ফিরিয়া আসে। সাতারা আসে, রাজগড় আসে, সিংহগড় আসে, তোর্‌ণা ও পান্‌হালাও আসে। বিফলতার বেদনায় সম্রাটের মন কানায় কানায় ভরিয়া উঠে। এই তুর্গগুলি জয়ের জন্য সম্রাটকে তাঁহার অতিকায় বাদসাহি বাহিনীর কত না ক্ষতি, কত না ক্ষয় স্বীকার করিতে হইয়াছে! তিনি নিদারুণ অসুস্থ হইয়া পড়েন। দিন কয়েক জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে কাটাইয়া তিনি নিরাময় হইয়া উঠেন বটে, কিন্তু তাঁহার মন বারংবার তাঁহাকে বলিয়া দিতে থাকে, তিনি কত ভাগ্যহত। আর মহারাষ্ট্র জয়ের আশা নাই-ই যখন, সে দেশ হইতে সেনাবাহিনী ও নিজেকে লইয়া নিরাপদে প্রত্যাবর্ত্তন করাই এখন সম্রাটের মনোগত অভিপ্রায়। এই অনুসারে, আহম্মদ-নগর অভিমুখে বাদ্‌সাহি বাহিনী যখন অপসরণ-রত, সেই সময়ে পথে মারাঠারা সেই বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগকে ভীম আক্রমণ করে। বহু নিহত হয়, বহু পলাইয়া বাঁচে। ঔরংজীবের নিজস্ব মালপত্র-বাহী শকটশ্রেণীও লুণ্ঠিত হয়। এমন কি, ধনাজী যাদবের সাহস আর কিছুটা অগ্রসর হইলে সম্রাটকে তিনি সশরীরে ধৃত করিতে

পারিতেন। তিনি সম্রাটের দেহরক্ষীদের নিকট পর্য্যন্ত পথ করিয়া যান, কিন্তু সম্রাটের একান্ত সান্নিধ্য ও তাঁহার রাজপ্রতাপের অত জাঁকজমকে ঐ কর্ম্মটি ধনাজীর সাহসে কুলায় নাই।

আহম্মদনগরের যে দুর্গে ঔরংজীব আশ্রয় লন, একুশ বৎসর আগে দিল্লী হইতে আসিয়া এখানেই তিনি তাঁহার শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই দিন তাঁহার বুক-ভরা আশা ছিল, মাস কয়েকের মধ্যেই সমগ্র দক্ষিণ-ভারত বিজয়ের বিজয়ছন্দ-হার বুকে দোলাইয়া তিনি দিল্লী ফিরিতে পারিবেন। কিন্তু এক, দুই, তিন করিয়া একুশ বছর পরে দেখেন শুধুই ব্যর্থতা, শুধুই ভাগ্যের প্রবঞ্চনা, শুধুই আলেয়ার আলো, শুধুই অনন্ত দুঃখ। এক এক বার মনে হইতে থাকে, আহম্মদনগরের আশ্রয়টুকুও বুঝি যায়। শেষ পর্য্যন্ত তাহা অবশ্য যায় নাই, কিন্তু ১৭০৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী উননব্বই বৎসর বয়সে জরা- ও যাতনা-জীর্ণ দেহটি রক্ষা করিয়া তিনিই চলিয়া যান।

সেদিন তারাবাঈ গৌরবের গৌরীশৃঙ্গে। সারা ভারত ঊর্দ্ধনেত্রে তাঁহার দিকে তাকাইয়া। শাহন্‌শাহ ঔরংজীবের বিরুদ্ধে লড়িয়া তিনি বিজয়িনী। দুই বৎসরের অপূর্ব্ব সাফল্য তাঁহার ভ্রূ-সঙ্গমে শুভ্র জয়টীকা আঁকিয়া দিয়াছে। তাঁহার অপূর্ব্ব জনপ্রিয়তা অবিশ্রান্ত শঙ্খধ্বনিতে তাঁহার জয় চরাচরে ঘোষণা করিতেছে। আর বিপক্ষীয় ঐতিহাসিক করুণ আক্ষেপে বলিতেছেন, হায়, তারাবাঈর নেতৃত্বের জন্যই ঔরংজীবের মারাঠা-বিজয়ের সমস্ত চেষ্টা ধূলিসাৎ হইয়া গেল।

* * * *

ইহার পর হইতে তারাবাঈর জীবনের আর এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়। উন্নত শিখর হইতে ধীরে ধীরে পতনের অধ্যায়। ধীরে ধীরে, স্তরে স্তরে। যেন সেই গৌরীশৃঙ্গের তুষার-গলা জলধারা তাঁহাকে সবেগে ঠেলিতে ঠেলিতে নীচে নামাইতে থাকে, তিনি সমস্ত শক্তি দিয়াও কিছুতেই সেই দুর্ব্বার বিকর্ষণের বিরুদ্ধে নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারেন না, সাত বৎসর পরে এমন এক স্থানে আসেন যেখান হইতে আর নীচে পড়া যায় না। এই অধ্যায় তাঁহার বুদ্ধির ও প্রতিভার সহিত একেবারেই খাপ খায় না, ইহাকে মুছিয়া বাদ দিতে পারিলেই ভাল হয়, কিন্তু ইতিহাস অকরুণ, ছাড়ে না। এই অধ্যায়ের জন্য ইতিহাস ঘটা করিয়া বহু তিক্ত ও কটু উপকরণ পাতায় পাতায় সাজাইয়া রাখিয়াছে। বহিঃশত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে তারাবাই জয়িনী হইয়াছিলেন, কিন্তু ইহার পর যে যুদ্ধ আরম্ভ হয় তাহা অন্তর্যুদ্ধ, নিজেদের ঘরোয়া যুদ্ধ, জ্ঞাতিবিরোধ, এবং সে যুদ্ধে তিনি হারিয়া যান। তাঁহার অত বুদ্ধি, অত প্রতিভার দীপ্তি কোনই কাজে লাগে না। তাঁহার ক্ষমতা-লোলুপতা সীমা ছাড়াইয়া গিয়া তাঁহার বুদ্ধি ভ্রংশ করিয়া দেয়, তিনি অন্ধের মত পথ হইতে বিপথে পা দিতে থাকেন।

ঔরংজীবের মৃত্যুর পর শম্ভাজীর পুত্র সাহু বন্দিদশা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মহারাষ্ট্র অভিমুখে আসিতে থাকেন। সেই সময় রাজসবাঈও কারাপ্রাচীরের মধ্যে থাকিয়াও তলে তলে পুত্রের জন্য ষড়যন্ত্র করিতে থাকেন। মারাঠা দলপতিদের অনেকেই দুই বিধবার অন্তর্যুদ্ধ নিবারণ করিতে সাহুকেই সিংহাসনে বসাইতে চান। অর্থাৎ তারাবাঈর পতনের ঢালু পথ

রচিত হইতে থাকে। তারাবাঈ তারস্বরে বলিতে থাকেন, শম্ভাজীর পর এই মারাঠা-রাজ্য রাজারামের নূতন জয়, ইহাতে সাহুর কোন দাবী নাই। তারপর তারাবাঈ পরমান্ন গ্রহণ করিয়া তাঁহার পুত্রের প্রতি আনুগত্যের শপথের জন্য সকল মারাঠা-প্রধানকে আদেশ করেন, কিন্তু তিন জন ছাড়া আর কেহই সে পরমান্ন গ্রহণ করেন না। তারাবাঈ পতনের পথে।

পুণার অদূরে খেড়্ নামক স্থানের যুদ্ধে তারাবাঈর বিরাট বাহিনী সাহুর হস্তে হারিয়া যায়। সাহু সাতারাকে রাজধানী করিয়া নিজেকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। মারাঠা জাতিও সাহুর পিছনে আসিয়া সমবেত হইতে থাকে। গৃহবিবাদের কলঙ্ক অবসানের জন্য সাহু তারাবাঈকে উদার সর্ত্তাবলী প্রদান করিয়া একটা আপোষ করিতে চান, কিন্তু তারাবাঈর, বা সমধর্ম্মীর, চরিত্র আপোষ জানে না। দর্পভরে তারাবাঈ সে সব সর্ত্তের দিকে ফিরিয়াও চাহেন না। অর্থবল ও সৈন্যবল উভয়েরই অনটন সত্ত্বেও, যে কৌশল ও কূটবুদ্ধিতে ছিল তাঁহার অসামান্য অধিকার, তাহারই উপরে নির্ভর করিয়া তিনি জয়-সাধনায় অটল হইয়া থাকেন। কিছুদিন পালা করিয়া জয় ও পরাজয়ের পর, কোল্‌হাপুরকে তারাবাঈ তাঁহার পুত্রের রাজধানী বলিয়া ঘোষণা করেন। এইরূপে মহারাষ্ট্র-রাষ্ট্র দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়, এবং সাতারা ও কোল্‌হাপুর দুই রাজধানী দুই অনুজ্জ্বল তারকার মত একই মহারাষ্ট্র-গগনে বিরাজ করিতে থাকে। তারাবাঈ পতনের মধ্য স্তরে। যুদ্ধক্ষেত্রে যখন সাহুর অবস্থা টলমল, সেই সময়ে অর্থকৃচ্ছ্রতার পক্ষে তারাবাঈর বিজয়-

রথের চাকা আটকাইয়া না গেলে, এবং তাঁহার অনুবর্ত্তিগণের মধ্যে সমস্বার্থতার অভাব সেই পঙ্কে আরও জল না ঢালিলে, হয়ত তারাবাঈ আবার দুই রাজধানীকে এক করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা ত হইলই না, বরঞ্চ ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজসবাঈয়ের হাতে বন্দিনী হইয়া পান্‌হালা-দুর্গে অবরুদ্ধা হন। তারাবাঈর পতন সম্পূর্ণ হয়।

সতর বৎসর ধরিয়া তারাবাঈ সেই কারাপ্রাচীরের অন্তরালে থাকেন। তারপর রাজসবাঈর পুত্রের সহিত সাহুর বাহিনীর এক যুদ্ধ ঘটে। সেই সময় পান্‌হালা হইতে তারাবাঈ ও রাজসবাঈ উভয়েই ধৃতা হইয়া সাহুর নিকটে আনীতা হন। সাহু সসম্মানে রাজসবাঈকে পান্‌হালায় পাঠাইয়া দেন, কিন্তু তারাবাঈ আর পান্‌হালায় ফিরিয়া যাইতে চান না। পান্‌হালায় ও সাতারায় তাঁহার নিকট কোনও প্রভেদই নাই, তিনি সাতারার কারাগারে থাকা প্রার্থনা করেন। সাতারার দুর্গমধ্যে এক পুরাতন প্রাসাদ সংস্কৃত হইয়া তারাবাঈর বাসস্থান নির্ণীত হয়।

সাতারার এই বন্দিনিবাসে তারাবাঈকে ঠিক বন্দিনীর মত থাকিতে হয় নাই, একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা গৃহমধ্যে যেরূপ মর্য্যাদায় জীবন-যাপন করিয়া থাকেন, তাঁহার থাকা সেইভাবেই। কিন্তু গৃহটি নিতান্তই পরকীয়, সেখানকার কপাট খুসী মত খোলে না, ভিতরে হাওয়া বদ্ধ, উপরে আকাশ এক খণ্ড। আর এক আঠার বৎসর ধরিয়া তাঁহাকে এইখানে কাটাইতে হয়। তখন তিনি পঁচাত্তরের কাছাকাছি। চুলগুলি সব পাকিয়া

গিয়াছে, গায়ের চামড়া লোল। সহসা তিনি শুনিতে পান, নিঃসন্তান সাহু উত্তরাধিকার রক্ষার জন্য পোষ্যপুত্র গ্রহণের উদ্যোগ করিতেছেন। সহসা তাঁহার নিজের মনে হয়, কে যেন তাঁহার জীবন হইতে অর্দ্ধেক বয়স-রেখা মুছিয়া দিয়া যায়। তিনি যেন অনুভব করেন, কারাপ্রাচীর ভেদ করিয়া সহস্র রন্ধ্রপথে কোথা হইতে আলোকের রাগ-রেখা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে আসিয়া পড়িয়াছে, তাঁহার যেন বোধ হয়, আবার তিনি যৌবনের তেজে উঠিয়া ছুটিতে পারেন।

সহসা তারাবাঈ সাহুর নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দেন, তাঁহার মৃত পুত্র শিবাজীর রামরাজা নামে তেইশ বছরের এক পুত্র আছে, রাজসবাঈর পুত্রের ও তাঁহার পত্নীর অত্যাচারের ভয়ে অতি শৈশবেই তাহাকে গোপনে অন্যত্র সরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, এখন সে তাহার ভগিনীর নিকট এক গ্রামে বাস করিতেছে; অতএব ছত্রপতির বংশগত উত্তরাধিকারী বিদ্যমান থাকিতে অপরের এক পুত্রকে ধরিয়া সিংহাসন দিতে যাওয়া কেন? সহসা সাহু বিস্ময়ের ঘোরে একথা বিশ্বাস করেন নাই, কিন্তু পরে জনৈক ধর্ম্মভীরু ব্যক্তির সাক্ষ্যে ও শপথে তাঁহাকে বিশ্বাস করিতেই হয়। দত্তকপুত্র লওয়া বন্ধ হইয়া যায়, এবং কিছুদিন পরে সাহুরও মৃত্যু হয়। বালাজী বিশ্বনাথের পুত্র বালাজী বাজীরাও এখন পেশোয়া, রাষ্ট্রের প্রায় সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী। সেই সকালেই সেই গ্রাম হইতে রামরাজাকে রাজকীয় জমকে আনাইবার জন্য লোকজন, হাতীঘোড়া প্রেরিত হয়। তারাবাঈর স্থান আর কারাগারে নয়। প্রফুল্লিতা

তারাবাঈ কৃষ্ণানদীর তীর পর্য্যন্ত আগাইয়া গিয়া রামরাজার সহিত মিলিতা হন, এবং প্রকাশ্যে পৌত্রকে আলিঙ্গন করেন। পরে তাঁহার সহিত পান-ভোজন করিয়া মারাঠা সর্দ্দারদের আর কোনও সংশয়ই থাকিতে দেন না যে, রামরাজা সত্যসত্যই তাঁহার পুত্রের পুত্র।

ঘটনার স্রোত বহিয়া চলে। সাতারায় রামরাজা রাজা হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই স-দুঃখে ও স-বিরক্তিতে তারাবাঈ আবিষ্কার করেন তাঁহার পৌত্রটি শাসন-ব্যাপারে তাঁহার কর্তৃত্ব মানিতে চায় না, সে পেশোয়ার হাতের ক্রীড়নক। পেশোয়ার কথাই তাঁহার বেদ। ক্রমে তাঁহাদের সম্পর্কটা শত্রুতায় পরিণত হয়, তারাবাঈ রামরাজাকে কুৎসিত ভাষায় গালাগালি আরম্ভ করেন। এখন ক্ষমতার কাড়াকাড়ি লইয়া যে অন্তর্ব্বিবাদের সৃষ্টি হয় তাহা তারাবাঈ ও পেশোয়ার মধ্যে। তারাবাঈ পেশোয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিয়া দেন, এবং রামরাজাকে কিছুতেই আয়ত্তের মধ্যে আনিতে না পারিয়া, নিজের সেই মুখে পুনশ্চ ঘোষণা করেন, রামরাজা তাঁহার পুত্রের পুত্র নন, একজন প্রবঞ্চক। কিছুদিন পরে একদিন, সেদিন চম্পাষষ্ঠীর উৎসব, প্রত্যূষে তারাবাঈ একজন অনুচরকে পাঠাইয়া দেন রামরাজাকে সারাদিন তাঁহার সহিত সাতারার দুর্গমধ্যে তাঁহার প্রাসাদে কাটাইবার নিমন্ত্রণ করিতে। রামরাজার পক্ষের দুই একজন তাঁহাকে এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে নিষেধ জানান, কিন্তু তারাবাঈর অনুচরের বাক্‌চাতুর্য্যে অভিভূত হইয়া রামরাজা পিতামহীর নিকট যাইতে স্বীকার করেন। একাকীই তিনি

দুর্গে আসেন। তারাবাঈ তাঁহাকে প্রচুর আদর-আপ্যায়ন করেন, এবং যত্ন করিয়া খাওয়ান। তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া রামরাজা দুর্গের দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া দেখেন, দ্বার বন্ধ। প্রহরীদের তিনি দ্বার খুলিয়া দিতে বলেন, তাহারা জানায় তারাবাঈর আদেশ, তাঁহাকে দুর্গের বাহিরে যাইতে দেওয়া হইবে না। তিনি ফিরিয়া তারাবাঈকে খুঁজিতে যান, কিন্তু তাঁহার দর্শন মিলে না, পরিবর্ত্তে দেখেন তাঁহার প্রাসাদটি সৈন্যে ভরা। তৎক্ষণাৎ তাহারা রামরাজাকে বন্দী করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করে। সেই কারাগারেই রামরাজাকে বাকী জীবন কাটাইতে হয়। আটষট্টি বৎসর ধরিয়া রামরাজা ও তাঁহার বংশধরগণ সাতারার দুর্গে বন্দী থাকিবার পর ইংরাজেরা আসিয়া তাঁহাদের মুক্তি দেন। এইভাবে শিবাজীর বংশের ক্ষমতা ও গৌরব লুপ্ত হইয়া যায়।

রামরাজাকে বন্দী করিয়া তারাবাঈ নিজের হাতে শাসন-ভার গ্রহণ করেন। জন্মগত ব্যাপারে নিরপরাধ রামরাজাকে কারারুদ্ধ করায় মহারাষ্ট্রের জনমত তারাবাঈর বিরুদ্ধে যায়, এবং তাঁহার নিন্দা ও অখ্যাতিতে দেশ ভরিয়া উঠে। বছরখানেক পর তাঁহার সুবুদ্ধির উদয় হয়, তিনি বুঝিতে পারেন যে, পেশোয়ার সহিত সন্ধি করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। পেশোয়া ও তারাবাঈর মধ্যে এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। যতই দিন যায়, পেশোয়ার সহিত তারাবাঈর সম্পর্ক ততই হৃদ্য হইতে থাকে। তারপর ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে সাতাশী বৎসর বয়সে সাতারায় তারাবাঈ অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁহার উত্থান ও

পতনের চাকার ধ্বনি চিরকালের মত স্তব্ধ হইয়া যায়। শুধু রহিয়া যায় সেই কাহিনীটা। ইতিহাস জানে সেই কাহিনী। ইতিহাস বলে, তারাবাঈর জীবনের শেষার্দ্ধ ভারতের নারীর যথার্থ পরিচয় নয়, তাহার শোচনীয় ব্যতিক্রম মাত্র।
